রিসার্চ প্রকাশনা

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি

প্রকাশকাল ঃ

জিলহাজ্ব ১৪৩৩, অক্টোবর ২০১২

উপদেষ্টা পরিষদ ঃ

সৈয়দ আহমাদ
এম এ হান্নান
মুফলেহ আর ওসমানী
এ কে এম নূরুল ফজল বুলবুল

সম্পাদনা পরিষদ ঃ

সৈয়দ রেজাউল করিম
মোবারক হোসেন চৌধুরী সমির
ইঞ্জিনিয়ার নুরুল হক

সম্পাদক ঃ

মোহাম্মাদ জাফর

প্রকাশনায় ঃ

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি
১১১, গুলশান এভিনিউ, গুলশান মডেল টাউন
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৮৮২৯২৪৩, E-mail:gcmisbd@gmail.com
Website: www.gcmisbd.org

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ঃ

দি ইসলামিক রিসার্চ সোসাইটি বাংলাদেশ - IRSB (প্রস্তাবিত)
(গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটির একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
Website: www.irsb.net

মুদ্রণ ঃ

রিনি প্রিন্টার্স
বনানী, ঢাকা-১২১৩, ফোন ঃ ৯৮৮২৪২২
Email: rini.printers@gmail.com

সূচি পত্র

- পবিত্র কুরআনে দাওয়াত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ'র বাণী - সৈয়দ আহমাদ ৩
- হজ্জ এবং কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য - এম এ হান্নান ৮
- গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদে বিভিন্ন জু'মায় প্রদত্ত খুতবার উদ্বৃতাংশ ঃ - মাওলানা মাহমূদুল হাসান ১৪
- Profiling a Muttaqi – Mufleh R. Osmany ১৯
- ইতিহাসের আলোকে হারামাইন শরীফাইন - এ কে এম নূরুল ফজল বুলবুল ২৪
- Islam- A Realistic Interpretation – Muhammad Zafor ২৮
- তাকওয়া ঃ (বা আল্লাহ ভীতি) - সৈয়দ রেজাউল করিম ৩৩

- বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ধারা - মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ৩৯
- ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যাকাতের শরীয়াহ গুরুত্ব - ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া ৪৭
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ - ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান ৫৪
- ইসলাম ন্যায় ও সামাজিকতার ধর্ম - আহমদ সেলিম রেজা ৫৬
- Members of the Executive Committee of the Gulshan Central Masjid and Iddgah Society
- Members of the Governing Body of the Islamic Research Society

পবিত্র কোরআনে দাওয়াত সম্বন্ধে মহান আল্লাহর বাণী

সংকলনে ঃ সৈয়দ আহমাদ

সূরা বাকারাহ্-২

আয়াত (১৫৯) ঃ আমি যে সব উজ্জ্বল নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে উহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরেও যারা ঐ সব বিষয়কে গোপন রাখে আল্লাহ্ তাদেরকে লানত করেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ করে ।

সূরা আলে ইমরান-৩

আয়াত (১৯) ঃ নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহ্র নিকট একমাত্র ধর্ম ।

আয়াত (৪১) ঃ এবং স্বীয় রবকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

আয়াত (১০৪) ঃ এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত–যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে।

আয়াত (১১০) ঃ তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।

সূরা নিসা-৪

আয়াত (৫৯) ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং সেই সব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন।

আয়াত (৯৫) ঃ মোমেনদের মধ্যে যারা কোন দুঃখ-পীড়া ব্যতীতই গৃহে বসে থাকে, আর যারা স্বীয় ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে তারা সমান নয়। আল্লাহ্ ধন-প্রাণ দ্বারা জিহাদকারীদেরকে গৃহে উপবিষ্টদের উপর পদমর্যাদায় গৌরবান্বিত করেছেন।

আয়াত (১০০) ঃ আর যে কেউ আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করবে সে পৃথিবীতে বহু প্রশস্ত স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে এবং যে কেউ গৃহ হতে বহির্গত হয়ে আল্লাহ্র ও রাসূলের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে অতঃপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তা হলে নিশ্চয় এর প্রতিদান আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত রয়েছে এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল করুণাময়।

সূরা মায়েদা-৫

আয়াত (০২) ঃ নেক কাজ করতে ও খোদাভীতিতে (সংযমী হতে) তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর।

আয়াত (০৩) ঃ আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।

আয়াত (৩৫) ঃ হে মোমেনগণ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর সান্নিধ্য অন্বেষণ কর ও তাঁর (আল্লাহ্র) পথে জিহাদ কর, তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে।

আয়াত (৪৫) ঃ আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই যালিম।

আয়াত (৫৪) ঃ তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।

সূরা আন'আম-৬

আয়াত (৫১) ঃ তুমি এর (কোরআনের) সাহায্যে ঐ সব লোককে ভীতি প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে তাদেরকে তাদের রবের নিকট এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যেখানে তিনি ছাড়া তাদের না কোন সাহায্যকারী থাকবে, আর না থাকবে কোন সুপারিশকারী, যাতে তারা গোনাহ থেকে সাবধান হয়।

আয়াত (৭০) ঃ কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক যাতে কোন ব্যক্তি স্বীয় কর্ম দোষে আবদ্ধ হয়ে না যায়।

আয়াত (৯০) ঃ তুমি বলে দাও- আমি এর (কোরআন ও দ্বীনের তাবলীগের) বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না।

সূরা আ'রাফ-৭

আয়াত (৫৯) ঃ আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছি।

আয়াত (৮৫) ঃ আমি মাদাঈন (বাসীদের) কাছে তাদেরই ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছি।

আয়াত (১০৩) ঃ অতঃপর আমি মূসাকে আমার আয়াতসহ ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠালাম, কিন্তু তারা যুলুম করলো। সুতরাং এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল তা তুমি লক্ষ্য কর।

আয়াত (১৪২) ঃ আর আমি মূসাকে ওয়াদা দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির জন্য এবং আরো দশ দ্বারা ওটা পূর্ণ করেছি। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময়টি চল্লিশ রাত্রি দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে।

আয়াত (১৫৮) ঃ সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং তাঁর সেই রাসূল, নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। যিনি আল্লাহ্ ও তাঁর কালামের প্রতি ঈমান রাখেন এবং তোমরা তাঁরই অনুসরণ কর। তাহলে তোমরা অবশ্যই হেদায়াত (সঠিক পথ) প্রাপ্ত হতে পারবে।

আয়াত (১৮১) ঃ আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্য পথের দাওয়াত দেয় এবং অনুরূপ ন্যায়বিচার করে।

সূরা আনফাল-৮

আয়াত (৭২) ঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্য) হিজরত করেছে, নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করেছে, তারাই পরস্পরের বন্ধু।

আয়াত (৭৪) ঃ যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মুমীন। তাদের জন্য ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

সূরা তওবা-৯

আয়াত (১৮) ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করা তাদেরই কাজ যারা আল্লাহ্র প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান আনয়ন করে ও নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকেও ভয় করে না । অচিরে তারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।

আয়াত (২০) ঃ যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে আর নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা মর্যাদায় আল্লাহ্র সমীপে অতি বড় আর তারাই হচ্ছে পূর্ণ

সফলকাম।

আয়াত (৩৮) ঃ হে মোমেনগণ! তোমাদের কি হল যে যখন তোমাদেরকে বলা হয়-বের হও আল্লাহ্‌র পথে তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অলসভাবে বসে থাক) ঃ তা হলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুত পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস তো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য।

আয়াত (৩৯) ঃ যদি তোমরা বের না হও, তা হলে আল্লাহ্‌ তোমাদের কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা আল্লাহ্‌র (দ্বীনের) কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আল্লাহ্‌ সর্বক্ষমতার অধিকারী।

আয়াত (৪১) ঃ বাহির হও হালকা অথবা ভারী অবস্থায় এবং জানমাল নিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। উহাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি উহাই তোমরা জানতে।

আয়াত (১১১) ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মুমিনের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

সূরা ইউসুফ-১২

আয়াত (১০৮) ঃ বলে দিন এটাই আমার পথ, আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আমি আহবান করি বুঝে সুঝে এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ্‌ মহামান্বিত এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে শরিক স্থাপন করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।

সূরা রা'দ-১৩

আয়াত (৪০) ঃ তোমার কর্তব্য তো শুধু পৌঁছে দেয়া আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ।

সূরা নাহ্‌ল-১৬

আয়াত (১২৫) ঃ তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে (দাওয়াতের কাজে তর্ক-বিতর্ক করতে হলে) আলোচনা কর সুন্দরভাবে।

সূরা ত্যাহা-২০

আয়াত (৪৪) ঃ তোমরা (মুসা ও হারুন) তার (ফেরাউনের) সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

সূরা আম্বিয়া-২১

আয়াত (৮৫) ঃ আর স্মরণ করুন ইসমাঈল, ইদরীস এবং যুল্‌-কিফ্‌ল এর কথা, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ধৈর্যশীল।

সূরা হজ্জ-২২

আয়াত (৪১) ঃ তারা এমন লোক যাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে।

সূরা মুমিনুন-২৩

আয়াত (৪৪) ঃ অতঃপর আমি একের পর এক আমার রসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন জাতির নিকট তাদের রসূল এসেছেন তখনই তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে; অতঃপর আমি তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করলাম।

আয়াত (৯৬) ঃ মন্দের মোকাবেলা কর যা উত্তম তা দ্বারা। তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

সূরা শু'আরা-২৬

আয়াত (২১৪) ঃ তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও।

সূরা নামাল-২৭

আয়াত (১৮) ঃ যখন তারা (সুলাইমানের সৈন্যরা) পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছালো তখন এক পিপীলিকা বলল ঃ হে পিপীলিকা তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর যেন সুলাইমান এবং তার বাহিনী তাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে।

সূরা কাছাছ-২৮

আয়াত (৫০) ঃ অতঃপর তারা যদি আপনার আহবানে সাড়া না দেয় তবে আপনি জানবেন যে তারা শুধু নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করছে। আল্লাহর পথ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণ করে সে অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ যালিম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

আয়াত (৫৪) ঃ তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্য ধরেছে (সবর করেছে) এবং তারা ভালোর দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করেছে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে।

সূরা আনকাবুত-২৯

আয়াত (৬৯) ঃ বস্তুত যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছাবার পথসমূহ বাতিয়ে দিব। আর আল্লাহ্‌ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

সূরা ইয়াসিন-৩৬

আয়াত (২১) ঃ তোমরা অনুসরণ করে চল তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং তারাই হেদায়াৎ প্রাপ্ত।

আয়াত (২৬) ঃ তাকে বলা হলো ঃ জান্নাতে প্রবেশ কর। সে বলে উঠল ঃ হায় আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত!

আয়াত (২৭) ঃ আমার রব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আয়াত (৩০) ঃ হায় পরিতাপ! বান্দাদের উপর যে, তাদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছেন তখনই তারা তাঁর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে।

আয়াত (৬১) ঃ আর তোমরা আমার এবাদত কর। এটাই সরল ও সঠিক পথ।

সূরা সাফফাত-৩৭

আয়াত (১১৪) ঃ আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মূসা ও হারুনের উপর (১১৫) ঃ এবং তাঁদেরকে ও তাঁদের সম্প্রদায়কে উদ্ধার করেছিলাম মহাসংকট হতে।

আয়াত (১১৬) ঃ এবং আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তাঁরা হয়েছিলেন বিজয়ী।

সূরা হা-মীম সাজ্‌দা-৪১

আয়াত (৩৩) ঃ আর তার কথা অপেক্ষা উত্তম কার কথা হবে যে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে দাওয়াৎ দেয় (আহবান করে) সৎকর্ম করে এবং বলে আমি তো মুসলিমদেরই হতে একজন।

আয়াত (৩৪) ঃ বস্ত্তত ভালো এবং মন্দ সমান হতে পারে না। সুতরাং তুমি মন্দকে প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

সূরা শূরা-৪২

আয়াত (১৩) ঃ ... তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ কর না। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি মনোনীত করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন ।

আয়াত (২০) ঃ যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে ওরই কিছু দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।

সূরা যুখরুফ-৪৩

আয়াত (৩৫) ঃ আর এ সবই তো একমাত্র শুধু পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার। মূলত মোত্তাকি লোকদের জন্যই তোমার রবের নিকট রয়েছে আখিরাত ও তার কল্যাণ।

সূরা জাসিয়া-৪৫

আয়াত (৩০) ঃ অতঃপর যারা ঈমান আনবে ও সৎ কাজ করবে তাদের রব তাদের দাখিল করবেন স্বীয় রহমতে। এটাই মহাসাফল্য।

সূরা মোহাম্মদ-৪৭

আয়াত (১৭) ঃ যারা হেদায়াতের পথ অবলম্বন করে আল্লাহ্ তাদের হেদায়াতের পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদেরকে তিনি তাকওয়া দান করেন।

সূরা ফাত্হ-৪৮

আয়াত (২৯) ঃ বস্তুত যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্ম করবে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের।

সূরা যারিয়াত-৫১

আয়াত (৫৬) ঃ আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এই জন্যই যে তারা আমারই ইবাদত করবে।

সূরা নাজম-৫৩

আয়াত (২৫) ঃ বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্রই ।

সূরা ওয়াকিয়া-৫৬

আয়াত (৯৬) ঃ অতএব তুমি তোমার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

সূরা ছাফ্ফ-৬১

আয়াত (১০) ঃ হে মোমেনগণ! আমি কি তোমাদের এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদের রক্ষা করবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে? আয়াত (১১) ঃ তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে। আয়াত (১২) ঃ আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং দাখিল করবেন এমন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহ। এটাই মহাসাফল্য।

আয়াত (১৩) ঃ এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরও একটি অনুগ্রহ ঃ আল্লাহ্র সাহায্য ও আসন্ন বিজয়; এবং মুমীনদিগকে ইহার সুসংবাদ দিন।

সূরা আছর-১০৩

আয়াত (০২) ঃ মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। আয়াত (০৩) ঃ কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে।

সূরা নাসর-১১০

আয়াত (০১) ঃ যখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয়।আয়াত (০২) ঃ তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে।আয়াত (০৩) ঃ তখন তুমি তোমার রবের কৃতজ্ঞতাবাচক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্তক্ষমাশীল।

বাংলা ভাষ্য ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান কর্তৃক অনুবাদিত ‘কুরআন মাজীদ বাংলা অনুবাদ’ হইতে গৃহীত

সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সভাপতি, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি

হজ্জ এবং কুরবানীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

এম এ হান্নান

উপক্রমণিকা ঃ

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম। 'হজ্জ'-এর আভিধানিক অর্থ ঃ সংকল্প করা। পারিভাষিক অর্থ ঃ আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শরী'আত নির্ধারিত ক্রিয়া-পদ্ধতি সহকারে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ যেয়ারত করার সংকল্প করা। প্রতিটি সামর্থ্যবান মু'মিনের জন্য যত দ্রুত সম্ভব ইসলামের এই রুক্ন আদায় করা ফরয। হজ্জ মু'মিনকে যেমন আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়, তেমনি তার আত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ মুসলিম উম্মাহ্কে আল্রাহর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হতে উদ্বুদ্ধ করে। হজরত ইবরাহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধারা থেকে বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)- কে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। একত্ববাদ ও ঐক্যের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন হজরত ইবরাহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আ.)-এর যৌথ দোয়ার ফল।

ইসলামের ইতিহাসে ৬৩১ খ্রিস্টাব্দে নবম হিজরিতে হজ্জের বিধান ফরজ হলে নবী করিম (সা.) উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন, 'হে মানবগণ! আল্লাহ তোমাদের ওপর হজ ফরজ করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন কর।' (মুসলিম) পরের বছরে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.) হজ্জ আদায় করেন। তিনি যেখানে, যে সময়ে, যে তারিখে, যে নিয়মে যেসব আহকাম-আরকান পালন করেন, প্রতিবছর ৮ থেকে ১৩ জিলহজ মক্কা মোকাররমা এবং এর ১৫ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে নির্দিষ্ট নিয়মে সেভাবেই হজ্জ পালিত হয়। হাজার হাজার বছর ধরে তাওহিদের ঘোষণাকারী হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের উচ্চারণ, নিরঙ্কুশ আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হচ্ছে। উম্মতে মুহাম্মদীর কর্ণে ১৪০০ বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে কাবাগৃহের চারপাশে সুমধুর ধ্বনি 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' উচ্চারিত হয়ে আসছে।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকার। যথাঃ- (১) তামাত্তু (২) ক্বিরান এবং (৩) ইফরাদ।
এর মধ্যে 'তামাত্তু' সর্বোত্তম। যদিও মুশরিকরা একে হজ্জের পবিত্রতা বিরোধী মনে করত এবং হীন কাজ ভাবতো।

(১) হজ্জে তামাত্তু

হজ্জের মাসে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ শেষে মাথা মন্ডন করে বা চুল ছেঁটে হালাল হওয়ার মাধ্যমে প্রথমে ওমরাহ্র কাজ সম্পন্ন করা। অতঃপর ৮ই যিলহাজ্জ তারিখে স্বীয় অবস্থানস্থল হ'তে হজ্জের ইহরাম বেঁধে পূর্বাহ্নে মিনায় গমন করা। অতঃপর ৯ই যিলহাজ্জ আরাফার ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান ও মুযদালিফায় রাত্রি যাপন শেষে ১০ই যিলহাজ্জ সকালে মিনায় প্রত্যাবর্তন করে বড় জামরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করে কুরবানী ও মাথা মন্ডন শেষে প্রাথমিক হালাল হওয়া। অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' ও সাঈ শেষে পূর্ণ হালাল হওয়া। অতঃপর মিনায় ফিরে সেখানে অবস্থান করে ১১, ১২, ১৩ তিনদিন তিন জামরায় প্রতিদিন ২১টি করে কংকর নিক্ষেপ শেষে মক্কায় ফিরে বিদায়ী ত্বাওয়াফ সেরে দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।উল্লেখ্য যে, তামাত্তু কেবলমাত্র হারাম বা মীকাতের বাইরের লোকদের জন্য, ভিতরকার লোকদের জন্য নয়।

(২) হজ্জে ক্বিরান

এটি দু'ভাবে হ'তে পারে- (ক) একই সাথে ওমরাহ ও হজ্জের ইহরাম বাঁধা (খ) প্রথমে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে অতঃপর ওমরাহ্র ত্বাওয়াফ শুরুর পূর্বে হজ্জের নিয়ত ওমরাহ্র সঙ্গে শামিল করা।এই হজ্জের নিয়তকারীগণ যথারীতি ত্বাওয়াফ ও সাঈ শেষে আরাফা-মুযদালিফায় হজ্জের মূল আনুষ্ঠানিকতাসমূহ সেরে মিনায় এসে বড় জামরায় ৭টি কংকর নিক্ষেপ করে কুরবানী ও মাথা মুন্ডন শেষে প্রাথমিক হালাল হবেন।

অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' শেষে পূর্ণ হালাল হবেন। অতঃপর মিনায় ফিরে গিয়ে তিনদিন সেখানে অবস্থান করে কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় এসে বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষে বাড়ি ফিরবেন। বিদায় হজ্জে আল্লাহ্'র রাসূল (সাঃ) নিজে ক্বিরান হজ্জ করেছিলেন। কিন্তু যাদের সঙ্গে কুরবানী ছিল না, তাদেরকে তিনি তামাত্তু হজ্জ করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, এখন যেটা বুঝছি সেটা আগে বুঝতে পারলে আমি কুরবানী সাথে আনতাম না। বরং তোমাদের সাথে ওমরাহ করে হালাল হয়ে যেতাম (অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জ করতাম)। যদি ক্বিরান হজ্জকারীগণ ত্বাওয়াফ ও সাঈ শেষে মাথার চুল ছেঁটে হালাল হয়ে যান, তবে সেটা 'ওমরাহ' হবে এবং তিনি তখন 'তামাত্তু' হজ্জ করবেন।

(৩) হজ্জে ইফরাদ

শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধা এবং যথারীতি ত্বাওয়াফ, সাঈ ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতাসমূহ শেষ করে হালাল হওয়া। হজ্জে ক্বিরান ও ইফরাদের একই নিয়ম। পার্থক্য শুধু এই যে, হজ্জে ক্বিরানে 'হাদ্ই' বা পশু কুরবানী প্রয়োজন হবে। কিন্তু হজ্জে ইফরাদে কুরবানীর প্রয়োজন নেই।

হজ্জের কল্যাণ ও কার্যকারিতা

হজ্জের কল্যাণ ও কার্যকারিতা বর্ণনা করার পূর্বে হজ্জ কি রকমের ফরয, তা বলা আবশ্যক। আল্লাহ কালামে পাকে বলেছেন ঃ "মানুষের মধ্যে যাহাদের সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ'র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে হজ্জ করা তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করিলে সে জানিয়া রাখুক নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ব জগতের মুখাপেক্ষী নন।"- সূরা আল ইমরান ঃ ৯৭
এ আয়াতেই হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করাকে পরিষ্কার কুফরী বলা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার মধ্যে তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে ঃ
"আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পথের সম্বল এবং বাহন যার আছে সে যদি হজ্জ না করে, তবে এ অবস্থায় তার মৃত্যু ইহুদী ও নাসারার মৃত্যুর সমান বিবেচিত হবে।" [তিরমিযী]
"যার কোনো প্রকাশ্য অসুবিধা নেই, কোন যালেম বাদশাহ যার পথ রোধ করেনি এবং যাকে কোন রোগ অসমর্থ করে রাখেনি - এতদসত্ত্বেও সে যদি হজ্জ না করেই মরে যায়, তবে সে ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান হয়ে মরতে পারে।" [দারেমী]
হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বাখ্যা করে বলেছেন ঃ "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করে না, তাদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করতে ইচ্ছা হয়; কারণ তারা মুসলমান নয়,

মুসলমান নয়।" [বুখারী, মুসলীম]

আল্লাহতায়ালার উল্লিখিত ইরশাদ এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর খলিফার এ ব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যেকেই বুঝতে পারেন যে, হজ্জ করা সামান্য ফরয নয়। তা আদায় করা না করা মুসলমানদের ইচ্ছাধীন করে দেওয়া হয়নি। বস্তুত যে সব মুসলমানদের কা'বা পর্যন্ত যাওয়া আসার আর্থিক সামর্থ্য আছে, শারীরিক দিক দিয়েও যারা অক্ষম নয় তাদের পক্ষে জীবনের মধ্যে একবার হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য। তা না করে কিছুতেই মুক্তি নেই। দুনিয়ার যে কোণেই বাস করুক না কেন এবং যার ওপর ছেলে-মেয়ে ও কারবার কিংবা চাকরি-বাকরির যত বড় দায়িত্বই অর্পিত হোক না কেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও একজন মুসলমান যদি হজ্জকে এড়াতে চায় এবং অসংখ্য ব্যস্ততার অজুহাতে বছরের পর বছর তাকে ক্রমাগত পিছিয়ে দেয় সময় থাকতে আদায় না করে, তবে তার ঈমান আছে কিনা সন্দেহ। আর যাদের সমগ্র জীবনেও হজ্জ আদায় করার কর্তব্য পালনের কথা মনে জাগে না, দুনিয়ার দিকে দিকে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়- ইউরোপ-আমেরিকা যাতায়াতকালে হেজাযের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে–কা'বা ঘর যেখান থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ, তবুও হজ্জ আদায় করার খেয়ালও তাদের মনে জাগ্রত হয় না -তারা কিছুতেই মুসলমান নয়; মুসলমান বলে দাবি করার কোনোই অধিকার তাদের নেই, দাবি করলেও সেই দাবী হবে মিথ্যা। আর যারা তাদেরকে মুসলমান মনে করে, তারা কোরআন শরীফের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, জাহেল। এসব লোকের মনে যদি মুসলিম জাতির জন্যে দরদ থাকে তবে থাকতে পারে; কিন্তুতার কোনোই সার্থকতা নেই। কারণ তাদের হৃদয়-মনে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর বিধানের প্রতি ঈমানের কোনো অস্তিত্ব নেই, একথা স্বতঃসিদ্ধ ।

উল্লেখ্য যে, কোন নেক আমলই কবুল হয় না তিনটি শর্ত পূরণ করা ব্যতীত। (১) ছহীহ আক্বীদা (২) ছহীহ তরীক্বা ও (৩) ইখলাছে নিয়ত। অতএব শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের খালেছ নিয়তে ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছহীহ তরীক্বায় হজ্জ করলেই কেবল তা আল্লাহর নিকট কবুল হবার সম্ভাবনা থাকবে। পূত-পবিত্র এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ হজ্জ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি খাঁটিভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং এ ব্যাপারে সকল প্রকার লালসা ও ফাসেকী থেকে দূরে থাকে, সে সদ্যোজাত শিশুর মতই (নিষ্পাপ হয়ে) ফিরে আসে।"

কুরবানী

হজ্জ এবং ঈদুল আযহা উৎসবের একটি অঙ্গ হচ্ছে কুরবানী। কুরবানী হল চিত্তশুদ্ধির এবং পবিত্রতার মাধ্যম। আল্লাহর নৈকট্য, আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, সাম্য, মৈত্রী, সম্প্রীতির সুমহান মহিমায় ভাস্বর কুরবানী। কুরবানী আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) ও তদীয় পুত্র হাবিল-কাবীল এবং মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর সুমহান আত্মত্যাগ এবং আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা-ভরসা ও জীবনের সর্বস্ব সমর্পণের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয়।

কুরবানীর প্রথম পটভূমি

মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম কুরবানীর ঘটনা ঘটে আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র হাবিল-কাবীলের মাধ্যমে। কুরআনুল কারীমে হাবিল-কাবীলের কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে- 'হে রাসূল! আপনি তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হলো এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হলো না। সে (কাবীল) বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন (হাবিল) বলল, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন। সে (হাবিল) বলল, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার প্রতি হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' (মায়েদা ২৭-২৮)। তৎকালীন সময়ে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানীকে ভস্মীভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানী অগ্নি এসে ভস্মীভূত করত না তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হ'ত। হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি মোটাতাজা উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। কাবীল কৃষি কাজ করত সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়ম অনুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানীটি ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবীলের কুরবানী যেমনি ছিল তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে হাবিলকে বলে দিল 'অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব'। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত নীতিবাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবীলের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে (হাবিল) বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহতা'আলা মুত্তাকী ব্যক্তিদের কুরবানী কবুল করেন'।

কুরবানীর দ্বিতীয় পটভূমি

কুরবানীর প্রচলন আদি পিতা আদম (আঃ)-এর সময় থেকে শরু হ'লেও মুসলিম জাতির কুরবানী মূলত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এবং তদীয় পুত্র ইসমাঈল যবীহুল্লাহ (আঃ)-এর কুরবানীর স্মৃতি রোমন্থন, অনুকরণ অনুসরণে চালু হয়েছে। আল্লাহতা'য়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন অগি পরীক্ষা নিয়েছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট থেকে। তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় হিমাদ্রীসম ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী, 'যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে মাবনজাতির নেতা বানিয়ে দিলাম' (বাক্বারাহ ১২৪)।

ইসমাঈল (আঃ) যখন চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হ'লেন, তখন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রাণপ্র তিম পুত্রকে কুরবানী করার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হ'লেন। একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, নবীগণের স্বপ্নও 'অহি'। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল, আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করার নির্দেশ। এ নির্দেশটি সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল হ'তে পারত। কিন্ত স্বপ্ন দেখানোর তাৎপর্য হলো, ইবরাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নে প্রদত্ত আদেশের ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহর আদেশের সামনে মাথানত করে দেন। আত্মসমর্পণকারী ইবরাহীম (আঃ) এই কঠোর পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। তিনি পুত্র ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে বৎস ! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি'? উত্তরে ইসমাঈল বলেছিলেন, 'পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পালন করুন। আল্লাহ চাহেতো আপনি আমাকে ছবরকারীদের মধ্যে পাবেন' (ছাফফাত ১০২)।

আত্মনিবেদনের এ কি চমৎকার দৃশ্য ! জনমানবহীন মিনা প্রান্তরে ৯৯ বছরের বৃদ্ধ ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে এবং তাঁরই অনুরাগ ও প্রেমলাভ করার দুর্নিবার আগ্রহে পুত্রকে কুরবানীর মেষের মতই উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। আর কণ্ঠনালীকে কাটার জন্য বার্ধক্যের শেষ শক্তি একত্রিত করে শাণিত ছুরি তুলে ধরলেন। পুত্র ইসমাঈলও শাহাদতের উদগ্র বাসনা নিয়ে নিজের কণ্ঠকে বৃদ্ধ পিতার সুতীক্ষ্ণ ছুরির নিচে স্বেচ্ছায় সঁপে দিলেন। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য! পৃথিবীর জন্ম থেকে এমন দৃশ্য কেউ অবলোকন করেনি। এ দৃশ্য দেখে পৃথিবী যেন থমকে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি যেন অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে এ চরম পরীক্ষার দিকে। সকল সৃষ্টিই যেন নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যায় এ দৃশ্য অবলোকনে। কিন্তু না চরম আত্মত্যাগী ইবরাহীম (আঃ) ও চরম আত্মোৎসর্গকারী ইসমাঈল (আঃ) এ কঠিন ও চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও কৃতকার্য হ'লেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হলো- 'তখন আমি তাঁকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা

একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি এর পরিবর্তে যবেহ করার জন্য দিলাম এক মহান পশু' (ছাফফাত ১০৪-১০৭)। বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তা'য়ালা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি সদয় হ'লেন। ইসমাঈলের রক্তের পরিবর্তে তিনি পশুর রক্ত কবুল করলেন। আর ইবরাহীম (আঃ)-এর পরবর্তী সন্তানদের জন্য কুরবানীর সুন্নাতকে জারি রাখলেন।

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের এই মহান স্মৃতিকে চির জাগ্রত করার জন্যই ১০ যিলহজ্জকে আল্লাহ চিরস্মরণীয় ও বরণীয় করেছেন। জন্ম থেকে জীবনের ৯৯টি বছর ধরে একের পর এক পরীক্ষা করে যখন আল্লাহতা'য়ালা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হ'লেন, তখন তাঁর এই সুমহান কীর্তি পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিস্মরণীয় ও স্থায়ী করে দিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে। 'আমি তাঁর জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য পালনীয় করে রেখেছি' (ছাফফাত ১০৮)।

আজও আমরা সেই ইবরাহীমী সুন্নাতের অনুসরণেই প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে পশু কুরবানী করে থাকি। এটি মুসলিম মিল্লাতের অন্যতম একটি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ক্বিয়ামত উষার উদয়কাল পর্যন্ত এই মহান আত্মত্যাগের ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

কুরবানীর শিক্ষা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে হয়, 'তোরা ভোগের পাত্র ফেলরে ছুঁড়ে, ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ'। মানুষ আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবে, এই শিক্ষাই ইবরাহীম (আঃ) আমাদের জন্য রেখে গেছেন। মহানবী মুহাম্মাদ (সাঃ) আমাদের জন্য ঐ ত্যাগের আনুষ্ঠানিক অনুসরণকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। আর ঈদুল আযহার মূল আহবান হলো সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করা। সকল দিক হ'তে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া। সম্পদের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর মুহাববত সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি আত্মসমর্পণ করে দেয়াই হলো কুরবানীর মূল শিক্ষা।

মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহর রাহে কুরবানী দেয়ার সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেভাবে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মানবজাতিকে ত্যাগের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সে আদর্শ ও প্রেরণায় আমরা আমাদের জীবনকে ঈমানী আলোয় উজ্জীবিত করব, এটাই কুরবানীর মৌলিক শিক্ষা। ত্যাগ ছাড়া কখনোই কল্যাণকর কিছুই অর্জন করা যায় না। মহান ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে অফুরন্ত প্রশান্তি। কুরবানী আমাদেরকে আরও শিক্ষা দেয় যে, দুনিয়াবী সকল মিথ্যা, অনাচার, অবিচার, অত্যাচার, যুলুম, হানাহানি, স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা, অহমিকা, লোভ-লালসা ত্যাগ করে পৃথিবীতে শান্তি ও সাম্যের পতাকা সমুন্নত রাখতে।

পশু কুরবানী মূলত নিজের নফস তথা কুপ্রবৃত্তিকে কুরবানী করার প্রতীক। কুরবানী আমাদেরকে সকল প্রকার লোভ-লালসা, পার্থিব স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনার জৈবিক আবিলতা হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে মহান স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত বান্দা হওয়ার প্রেরণা যোগায় এবং সত্য ও হকের পক্ষে আত্মোৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করে। কুরবানীর সার্থকতা এখানেই। তাই পশুর গলায় ছুরি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা, কুফর, শিরক, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, রিয়া, পরচর্চা-পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মগর্ব, আত্মঅহংকার, কৃপণতা, ধনলিপ্সা, দুনিয়ার মায়া-মুহাববত কলুষতার মত যেসব জঘন্য পশুসুলভ আচরণ সযত্নে লালিত হচ্ছে তারও কেন্দ্রমূলে ছুরি চালাতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি মুহূর্তে প্রভুর আনুগত্য, আজ্ঞাপালন ও তাক্বওয়ার দ্বিধাহীন শপথ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষ ঃ

মুসলমানদের কুরবানী নিছক কোন আনন্দ-উল্লাসের উৎসব নয়, বরং এটি আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, আত্মসমর্পণের একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি কোন কপোল-কল্পিত উপাখ্যান বা কল্পনা ফানুসের ফলশ্রুতি নয়। বরং এ কুরবানীর সংস্কৃতির প্রবর্তক স্বয়ং মহান আল্লাহ। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ) যে অবিস্মরণীয় ত্যাগ, আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও আনুগত্যের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেই স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় ও পালনীয়কল্পে কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আবহমানকাল যাবৎ চলে আসছে। শুধু পশুর গলায় ছুরি চালানোতে কোন সার্থকতা নেই, বরং কাম-রিপু, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহমিকা-দাম্ভিকতা, অবৈধ অর্থ লিপ্সা, পরচর্চা-পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতাসহ যাবতীয় মানবীয় পশুত্বের গলায় ছুরি চালাতে পারলেই কুরবানীর সার্থকতা বয়ে আনবে।

মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) এ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন তাঁর সন্তানদের। জনৈক উর্দু কবি বলেন, 'যদি আমাদের মাঝে ফের ইবরাহীমের ঈমান পয়দা হয়, তাহ'লে অগ্নির মাঝে ফের ফুলবাগানের নমুনা সৃষ্টি হ'তে পারে'। সুতরাং ইবরাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী আত্মত্যাগের উত্থান যদি আবার জাগ্রত হয়, তবে আধুনিক জাহেলিয়াতের গাঢ় তমশা ভেদ করে পুনরায় মানবতার বিজয় নিশান উড্ডীন হবে। সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে আসবে। তাই কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি দেওয়ার পূর্বে নিজেদের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি দিতে হবে। মহান আল্লাহর দরবারে আত্মসমর্পণকারী ও আত্মত্যাগী হতে হবে। তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মুমিন বা মুত্তাকী হতে হবে। আমাদের ছালাত, কুরবানী, জীবন-মরণ সবকিছু আল্লাহর জন্যই উৎসর্গ হৌক বিধাতার নিকট এই প্রার্থনাই করি। সবশেষে আমাদের জাতীয় কবি আমি বলি বিশ্বকবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর 'কুরবানী' কবিতার কয়েকটি চরণ উল্লেখ করে ইতি টানছি।

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণকেতু লক্ষ্য ঐ তোরণ
আজি আল্লাহর নামে জান কোরবানে
ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন।

আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন।

সেক্রেটারী জেনারেল
গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি

গুলশান কেন্দ্রীয় মসজিদে বিভিন্ন জু'মায় প্রদত্ত খুতবার উদ্বৃতাংশঃ

মাওলানা মাহমূদুল হাসান

আখেরাতের গুরুত্ব

মৃত্যুর পর কবরে শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা দুনিয়া থেকেই করে যেতে হবে। দুনিয়া হলো আখেরাতের ক্ষেত। এই ক্ষেত থেকেই আখেরাতের ফসল কামিয়ে নিতে হবে। আমাদের দেশে নেতা বা বিখ্যাত কেউ মারা গেলে তার ভক্ত অনুসারীরা তার জন্য দাঁড়িয়ে ২-৩ মিনিট নীরবতা পালন করে। এতে কী লাভ তা তারাও জানে না। কেবল পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণমাত্র। এটা এই জন্য বললাম যে, কারাগারস্থ ব্যক্তির পেট ভরার জন্য এবং সেখান থেকে মুক্তির জন্য তো আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করেন না। বরং খাওয়ার জন্য খাদ্য নিয়ে যান, মুক্তির জন্য কত চেষ্টা-ফিকির ও দৌড়ঝাঁপ করেন, টাকা পয়সা ব্যয় করেন। তেমনি কবরস্থ ব্যক্তির জন্য করতে হবে। তবে এটার সিস্টেম ভিন্ন। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াত করে, দান-সদকা করে এর নেকী পাঠাতে হবে। এখন কথা হচ্ছে কুরআন তেলাওয়াত, দান-সদকা ইত্যাদি নেক কাজ মৃত ব্যক্তির পক্ষে কে করবে? হ্যাঁ এটাই তো ইসলাম শিক্ষা দিচ্ছে যে, তুমি মৃত্যুবরণ করার আগেই দুনিয়াতে নেককার সন্তান বানিয়ে যাও, যাতে তারা তোমার মৃত্যুর পর তোমার কাছে তোমার প্রয়োজনীয় রসদ পাঠাতে পারে। সন্তান নেককার বানাতে হয় কীভাবে? এটা নেককারদের থেকে জেনে নিতে হবে। পৃথিবীতে যত নেককার আছে তাদের প্রত্যেকেরই নেককার হওয়ার মূলে রয়েছে দ্বীনী শিক্ষা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। তাই প্রতিটি লোকের জন্য অতি জরুরী যে, সে তার সন্তানদেরকে দুনিয়াতে সঠিক দ্বীনী শিক্ষা শিখিয়ে যাবে, যাতে তারা নিজেরাও জান্নাতে যেতে পারে এবং পিতা-মাতাকেও জান্নাতে নিতে পারে। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুন।

ইসলাম পূণাঙ্গ জীবন বিধান প্রকৃত শান্তি ও সফলতার পথ

আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-শান্তি ও সফলতার পথ দেখানোর জন্য আল্লাহপাক সায়্যেদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্বাচন করেছেন। অতএব নির্দ্বিধায় একথা বলা যায় যে, মুসলিম, ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধসহ সকল জাতির শান্তি ও সফলতার জন্য একমাত্র পথ হলো রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ অনুসরণ অনুকরণ। যারা নবীর আদর্শ ও পথকে অনুসরণ করবে না তারা কোনদিনও প্রকৃত শান্তি সফলতার পথ খুঁজে পাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, " যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করতে বাধ্য থাকতেন।" অর্থাৎ ইহুদী-খ্রিস্টান তো দূরের কথা যদি তাদের নবীগণও জীবিত থাকতো তাহলে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ-অনুকরণ করা ছাড়া তাদের নাজাতের উপায় থাকতো না।

মুসলমানদের আকীদা হলো হযরত ঈসা (আঃ) -কে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি কেয়ামতের পূর্বে পুনরায় দুনিয়াতে আসবেন। ইহুদীদের আকীদা হলো হযরত ঈসা (আঃ)কে হত্যা করা হয়েছে। খ্রিস্টানদের অনেকের ধারণাও তাই। যারা বলে হযরত ঈসা (আঃ)কে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে তাদের ধারনা একদম ভিত্তিহীন। মুসলমানরা যদি এমন আকীদা রাখে তাহলে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন- তারা তাঁকে (ঈসা আঃ) হত্যা করতে পারেনি, ক্রুশবিদ্ধও করতে পারেনি বরং তাদের ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। এ বিষয়ে যারা মতানৈক্য করে তারা তো নিঃসন্দেহে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ করা ব্যতীত তাদের কোন জ্ঞানই নেই। একথা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করতে পারেনি বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।

দ্বীনের করুণ অবস্থা এবং আমাদের নির্লিয়তা

আমাদের দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দিশ। কিন্তু বড় ব্যথা ও কষ্ট লাগে এদেশের মুসলমানের, ধর্মীয় শিক্ষা, তাহযিব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-কালচারের প্রতি তাকালে। হাশরের ময়দানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে আমাদের জবাব দেয়ার মতো কী আছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মদীনার মাটিতে শুয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, তোমাদের দেশ তো মুসলিম প্রধান দেশ, হাফেয-মাওলানা, আলেম-উলামা, মুফতি, পীর-মাশায়েখদের দেশ, মাদরাসা-মসজিদের দেশ, তাহলে তোমাদের দেশে আল্লাহর দ্বীন ও আমার সুন্নতের এই দুরবস্থা কেন? নবীর শাফাআত ছাড়া হাশরের ময়দানে এক কদম চলাও কি সম্ভব হবে? তাহলে আমরা কী বিশ্বাস নিয়ে দুনিয়াতে চলাফেরা করছি? নিজের স্বার্থের উপর যখন কোন আঘাত আসে তখন আমরা হৈ চৈ শুরু করি, প্রতিহত করতে উদ্যত হই, অথচ দ্বীনের ও সুন্নতের এই করুণ অবস্থা দেখেও আমরা স্থির ও নির্লিয় থাকি কীভাবে? মনে হয় নবীর সুন্নত এই দেশে ইয়াতিম হয়ে গেছে। শুধুমাত্র শুক্রবারের নামায পড়লেই কি ঈমানদার ও মুমিন হওয়ার দাবি করা যায়? প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে এবং সুন্নত তরিকায় অন্যান্য ইবাদত করতে হবে। শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদতে আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য নেই। আমাদেরকে কাফের বেদ্বীনদের চরিত্র ও সংস্কৃতি ছেড়ে নবীর আদর্শে আদর্শবান হতে হবে। আজ ইহুদী-খ্রিস্টানরা মুসমানদের সংস্কৃতি বিলুপ্ত করে নিজেদের সভ্যতা সংস্কৃতি চালু করছে। আর আমরা নাকে তেল দিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন আছি। আমরা শুধু অর্থের পেছনে, ক্ষমতার পেছনে পাগলপারা হয়ে ঘুরছি। পরকালীন জীবনের কথা ভাবার সময় পাই না।

ভাইয়েরা আমার! আমাদের শেষ হাতিয়ার হলো, খাঁটি মনে তাওবা করে আল্লাহর কাছে অতীতের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। মানুষ মাত্রই ভুল হয়, এই ভুলের জন্য খাঁটি মনে এস্তেগফার করলে আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দূরে সরাবেন না। হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই বলেছেন।

মানব রচিত সংবিধান ও আল্লাহ প্রণীত সংবিধানের পার্থক্য

আল্লাহপাক পৃথিবীতে যত জিনিস সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে মানুষ হলো সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। এই সর্বোত্তম সৃষ্টির উপকারার্থেই তিনি মহাবিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য যদি না থাকতো তাহলে আল্লাহ পাক এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করতেন না। পৃথিবীতে শুধু একজন মানুষ বেঁচে থাকতে হলেও বিশাল এই পৃথিবীর প্রয়োজন পড়ে। যেমন মাদরাসা-স্কুলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এভাবে পাঁচটি ক্লাস আছে। মনে করুন এই পাঁচটি ক্লাসের জন্য পাঁচজন শিক্ষকের প্রয়োজন । কারণ প্রত্যেক ক্লাসেই দশ, বিশ কিংবা ত্রিশ জন ছাত্র আছে। এই বিশ-ত্রিশজন ছাত্রকে পড়ানোর জন্য একজন শিক্ষকই যথেষ্ট। এখন যদি কোন শ্রেণীতে মাত্র একজন ছাত্র থাকে তাহলে তার জন্যও একজন শিক্ষক লাগবেই।

আকাশে যখন সূর্য উদিত হয়, তখন এর আলোর দ্বারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ উপকৃত হয়। আর যদি পৃথিবীতে কেবল একজন মানুষ থাকে তাহলেও তার প্রয়োজন পূরণার্থে সূর্যের উদিত হওয়া লাগবেই। এভাবে একদিকে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই পৃথিবীকে আল্লাহ পাক একজন মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন, অপরদিকে চিন্তা করলে দেখা যায় কোটি কোটি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি মহান কুদরত ওয়ালা!

আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণার হুকুম

আল্লাহতায়ালা মানুষকে সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে অসংখ্য-অগণিত সৃষ্টি বিদ্যমান। এগুলো থেকে যে কোনো একটি নিয়ে গবেষণা করলেই আল্লাহর কুদরতের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ তার সাড়ে তিন হাত শরীরের মাঝে চিন্তা করলেও তা বুঝতে পারবে যে, তাকে কে সৃষ্টি করেছেন। শরীরের পঞ্চ ইন্দ্রীয় নিয়ে চিন্তা করলেও বুঝতে সক্ষম হবে। যেমন পঞ্চ ইন্দ্রীয়ের একটি হলো চোখ, এর দ্বারা আমরা দৃশ্যমান সব বস্তু দেখতে পাই। রাস্তায় চলার পথে চোখের সাহায্য কত দরকার তা বলাই বাহুল্য। এছাড়াও মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও অন্যান্যদেরকে পৃথক পৃথকভাবে সহজে চেনা যায়। আরেকটি হলো নাক; এর দ্বারা মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে, তদরূপ যে কোনো বস্তুর ঘ্রাণ শুঁকে বুঝতে পারে যে, সেটা পচা না ভালো। আরেকটি হলো কান; চতুর্থটি হলো হাত, আর পঞ্চমটি হলো ত্বক। এর প্রত্যেকটিই মানুষের নানা উপকারে ব্যবহৃত হয়। এগুলো কে দিয়েছেন? মানুষ কি এর কোনটি অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছে? মহান দয়ালু আল্লাহ পাকের এত দয়া যে, বান্দার কোনরূপ আবেদন-নিবেদন ছাড়াই তিনি তাকে এসব দান করেন। এগুলো ব্যতীত মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগীতে জীবন-যাপন করতে সক্ষম নয় বলেই তিনি তা শরীরের মাঝে ফিট করে দিয়েছেন। এগুলো আল্লাহ পাকের দান। এসব নিয়ে চিন্তা-ফিকির করলেই বান্দার মুখে বের হবে কুরআনের এই আয়াত-" পরওয়ারদেগার! এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই। আমাদের তুমি দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও।"

মানুষকে মানুষ বানায় কোন শিক্ষা? ইসলামের স্বাতন্ত্র্য

ইসলামের দুশমনরা যেখানেই যায় সেখানেই দেখে মুসলমানদের ব্যাপকতা ও ইসলামের প্রচার-প্রসার, যা তাদের ধর্মে নেই। এই ব্যাপকতার কারণ হলো, ইসলামের নীতি-আদর্শের মধ্যে যে মানবতা, সেবা, দয়া-মুহাব্বত ও সহযোগিতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা অন্য কোন ধর্মের মাঝে নেই। বিশ্বের যেখানেই যাবেন মুসলমান পাবেন। ইহুদী, খ্রিস্টান ও হিন্দুদের অবস্থান এরকম নয়। একারণেই দুশমনরা মুসলমানদের শিক্ষা ও আদর্শকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তারা একটা স্লগান সৃষ্টি করেছে-"নারী ও পুরুষের সমান অধিকার চাই।" আমি আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে, নারীর অধিকার যতটা ইসলামী শিক্ষার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, ততটা কি অন্য শিক্ষায় আছে? এর বিশ্লেষণ করতে গেলে কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে।

মানুষের মৌলিক অনেক বিষয় রয়েছে যার সমাধান একমাত্র ইসলামই দিয়েছে। যেমন, বৈবাহিক বিষয়। এক্ষেত্রে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, কাকে বিবাহ করবে, মেয়ে কেমন হবে, ছেলে কেমন হবে, সাক্ষী কেমন হবে, মোহর কত হবে, মোহর কখন আদায় করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেকে লক্ষ লক্ষ টাকা মোহর নির্ধারণ করে, অতঃপর তা আদায় করে না, মহিলার হক নষ্ট করে। অথচ ইসলাম এ ব্যাপারে স্বামীদেরকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করেছে। স্ত্রীর মোহর আদায় করার ব্যাপারে ইসলাম অত্যন্ত গুরত্ব দিয়েছে। অন্য কোন ধর্মে এর কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ইসলামী শিক্ষা এত ব্যাপক যে, 'মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে সমগ্র বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অন্তর্ভুক্ত আছে।"

সুন্নতী জীবনের সফলতা, ওলিরাই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান

আসলে আল্লাহর ওলীদের পরীক্ষা করতে যেতে হয় না। যদি বোঝা যায় যে, তিনি প্রকৃত আল্লাহর ওলী, তাহলে তার হাত ধরো, তার পিছে পিছে ঘোরো, তার কথা শোনো, তাহলে তোমার দিল নূরে ভরে যাবে। তোমার চেয়ে অনেক কিছু উনি বোঝেন, কিন্তু বলেন না। আল্লাহর ওলীরা সহজে মুখ খোলেন না চুপ থাকে ও এমনভাবে চলে যে, বোকা মনে হয়, বুদ্ধিহীন মনে হয়। আসলে তারা সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। তা না হলে তাঁরা আল্লাহর জন্য দুনিয়া ছাড়েন কিভাবে? আখেরাতের স্থায়ী শান্তির জন্য দুনিয়ার এই শান্তি ত্যাগ করে। বুদ্ধিমান বলেই তো এটা করে। এক কোটি টাকা ডানে রাখা আর এক লাখ টাকা বামে রাখা, আপনি কোনদিকে যাবেন? যদি ব্রেন ঠিক থাকে তাহলে অবশ্যই এক কোটির দিকে যাবেন। আল্লাহর ওলীরা বোঝে যে, এটা চিরস্থায়ী জীবন নয়, এ জীবন একভাবে না একভাবে কেটে যাবে। পয়সাওয়ালা হলেও কাটবে, গরীব হলেও কেটে যাবে, সমস্যা নেই। কিন্তু কবর ও আখেরাতের জীবন স্থায়ী জীবন, সেখানে আমি বাদ্শা হতে চাই, সেখানে আমি রাজা হতে চাই। যারা কুরআন বোঝে, আল্লাহ তাদের মেধা দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়েছেন, মানুষ তাদেরকে পাগল বলে, নির্বোধ বলে, আরও কিছু আধুনিক গালি দেয়, কিন্তু তারা এগুলো সব শুনেও দুনিয়ার এক লাখের আশা বাদ দিয়া এক কোটির আশায় আল্লাহর দিকে পাগল হয়ে দৌড় দেয়।

হযরত দাব্বাগ (রহঃ) বললেন, আমি কিভাবে বুঝি জান? যখন কোরআন শরীফ, হাদীস শরীফ পড়ো তখন তোমার মুখ দিয়ে নূর বের হতে থাকে। তখন আমি বুঝি যে এটা কোরআন-হাদীস। আর যখন তুমি নিজের আরবী কথা বল, এটা দিয়ে নূর বের হয় না, তখন বুঝি এটা আল্লাহর কুরআনও নয়, হাদীসও নয়, এটা তুমি নিজে বানিয়ে বলেছ। তখন ইরানী সাহেব বললেন; আচ্ছা বুঝলাম যে, যখন নূর বের হয় তখন বুঝতে পারেন যে, এটা কুরআন-হাদীস। কিন্তু কুরআন এবং হাদীস এ দুটার মধ্যে পার্থক্য করলেন কিভাবে? দুটোই তো নূর? তখন বললেন ঃ এ পার্থক্য করেছি এভাবে, যখন কুরআন শরীফ পড়ো তখন যে নূরটা বের হয় এটা সূর্যের আলোর মতো, আর যখন হাদীস পড়ো তখন যে নূর বের হয় এটা চন্দ্রের আলোর মতো। এতে আমি বুঝি যে, এটা কোরআন আর এটা হাদীস। (আল্লাহু আকবার) আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের হাকীকত বুঝে আল্লাহ ওয়ালাদের মতো এই ক্ষণস্থায়ী জীবন পার করার তাওফীক দান করুন।

যুব-শ্রেণীর পাপাসক্ত হওয়ার দায় কার? ছেলের অধঃপতনের জন্য প্রধান দায়ী কে?

আমাদের ছেলেরা ইহুদী-নাসারাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছে। এসব কি তার নিজের ইচ্ছায় বা নিজের চেষ্টায় হচ্ছে? সে যদি কাফেরী লেবাস পরে থাকে, তাহলে সে কি প্রথম থেকে তার ইচ্ছায় পরছে? নাকি আমি তাকে পরতে দিয়েছি? কাফেরদের সাথে চলাফেরা করছে, এটা কি প্রথম থেকেই তার ইচ্ছায় চলাফেরা করছে, না কি আমি তাকে এমন পথে পরিচালিত করেছি? সুতরাং বাস্তব কথা হলো, প্রত্যেকটা সন্তান সেভাবেই গড়ে উঠেছে, যেভাবে তার অভিভাববরা তাকে পরিচালিত করছে। ধীরে ধীরে এভাবেই সমাজের এই অবস্থা হয়েছে। এই যে, সিডর, বন্যা, ভূমিধস ইত্যাদি মহা দুর্যোগ দেশে দেখা দেয়, এগুলোতো শাস্তি। মানুষের যে নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়েছে, চারিত্রিক যে অধঃপতন শুরু হয়েছে, নাস্তিকতা, বেঈমানী যেভাবে সয়লাব হয়েছে, পূর্বোক্ত আযাব ও গযবের আসল কারণ তো হল এগুলো। এসব দূর করার কি কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বা হবে? আল্লাহর দেয়া গজব তথা

দুর্যোগের মোকাবেলায় নামা হয় (নাউযুবিল্লাহ) অথচ এর পেছনের কারণ নিয়ে মোটেও ভাবা হয় না। এসব পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণতি। এ শিক্ষা মৃত্যুর পরে আর কিছু ভাবতে শেখায় না। তাই গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, যারা আজকে অপরাধের পর অপরাধ করে যাচ্ছে, তারা যেটুকু দায়ী তার চেয়ে কম নয় বরং বেশি দায়ী হলাম আমরা, যারা মসজিদের মধ্যে আসা যাওয়া করছি। কিন্তু নিজের চতুর্পাশে অপরাধ হচ্ছে, সেদিকে ভুলেও তাকাচ্ছি না। একটু কথাও বলছি না। নিজের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে সাথে সাথে প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়। পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি চলে আসে। খুব তাড়াতাড়ি আমার স্বার্থকে উদ্ধার করার জন্য যে কোন উদ্যোগ-পদক্ষেপ আমি নিতে পারি-কৌশলগত কিংবা আর্থিক, কিন্তু মানুষ চরিত্রহীন হয়ে যাচ্ছে, চুরি, ডাকাতি হাইজ্যাক, হত্যা, লুণ্ঠন সর্বত্র বাড়ছে. আমার ছেলে, আমার ভাতিজার দ্বারা এসব সংঘটিত হচ্ছে, আর আমি মসজিদে বসে বসে আফসোস করছি-হায় দেশের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে! অতএব, শুধু তাদেরকে দোষ দেয়া সংগত নয়। এটা আমার কথা নয়, কুরআনেই তো রয়েছে-"এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি আমি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিতে ধ্বংসাত্মক কার্য করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। আর যে কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো।"

এই আয়াতের সারমর্ম হল, সমাজের মধ্যে যদি কেউ চুরি করে, ডাকাতি করে, হত্যা করে, তাহলে সে ব্যক্তি গোনাহগার। আল্লাহপাক যখন বিচারে বসবেন, তখন এভাবে তদন্ত করবেন যে, সে যে হত্যা করল, কিভাবে হত্যা করল? হত্যা করার পরিবেশ কিভাবে সৃষ্টি হল? হত্যাকারীকে তার পিতা বাধা দিয়েছে কি না? তার সমাজের লোকেরা বাধা দিয়েছে কি না? যদি বলা হয় যে, না বাধা দেয়নি, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে যে, কেন তাকে বাধা দেয়া হল না, বাধা দেয়ার ক্ষমতা কি ছিল না কিন্তু দেয়া হয়নি, তার মুরব্বীরা তাকে সেভাবে গড়ে তোলেনি, যে কারণে আজ সে হত্যাকারী। সুতরাং আজকে এক নম্বর আসামী হলো তাঁর অভিভাবক তথা তার পিতা, তার উস্তাদ, তার পীর। আর দুই নম্বর আসামী হলো সে। হাদীসের মধ্যেও এসেছে- উপরোক্ত আয়াত ও এই হাদীসের একই অর্থ।

মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
খতিব, গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ, ঢাকা

Profiling a Muttaqi

Mufleh R. Osmany

A Muttaqi is one having the sublime attributes of Taqwa. Ranked at the highest level of spiritual advancement, a Muttaqi personifies the noblest reverence of a devout believer (Momen). The natural question would be, how does one become a Muttaqi. A Muttaqi strives hard to spiritually locate and navigate oneself on the Sirat-al Mustaqim (the straight path), which is a multi-lane spiritual highway defined by Shariah (i:e the laws of Holy Quran and the Holy Hadis). The infinite grace of Allah (Subhanahu wa Taala :SWT) guides & sustains a devout and striving (Mujtahid) believer on the Sirat-al Mustaqim. That means a Muttaqi must be a staunch and unflinching believer and striving hard (practice Muzahada) in the way of Allah (SWT), elevate oneself to a high spiritual level to merit special grace, blessings and guidance of Allah (SWT). Taqwa is partly acquired. But the most sublime aspects of Taqwa are inspired or gifted as a divine grace from Allah (SWT). These two means of ascending to higher levels of Taqwa are closely interlinked, spiritually. " … He is the Lord of Righteousness (Taqwa) and the Lord of Forgiveness." Surah Al-Muddathir, Ayat 56. Evidently righteousness (Taqwa) springs from the Will of Allah (SWT). Sublime inspiration of Taqwa emanates from the infinite grace and mercy of Allah (SWT).

It is Taqwa that makes a Muttaqi. On the other hand a Muttaqi strives hard to achieve the spiritual excellence of Taqwa. One is linked to the other in terms of cause and effect or means and end. Striving hard is the means and Taqwa is the end or goal. The substance cannot be achieved without perfect form. The end cannot be reached without mastering the means. Taqwa is the substance and all devotional practices (Aamal) collectively constitute the form. " Siam (Roza) has been made obligatory for you as it was obligatory on people who came before you, so that you can attain Taqwa". Surah Baqarah, Ayat 183. That shows Siam is the form and Taqwa is the substance. Taqwa belongs to the esoteric domain of inner world while most Aamals (devout practices) primarily belong to the visible world. Fear of Allah (SWT) (i:e: Taqwa) is the serene attainment of the inner world. To emphasize the primacy of substance in relation to form, the Holy Quran declares in Surah Al-Hajj at Ayat 37, "It is neither their meat nor their blood that reaches Allah, it is your piety (Taqwa) that reaches Him." Hence a Muttaqi is more concerned about the substance while forms of devout practices like Salat, Zakat, Siam and Hajj etc. are earnestly established by him as per the laws of Shariah. The heart (Ruh or inner world) is the abode of Taqwa. In Surah Al-Huzuraat at Ayat 3 the Holy Quran explains " ….. their hearts has Allah tested for piety (Taqwa)".

Taqwa appertains to a high level of spiritual excellence. Islamic scholars have elucidated the theological significance, scope, and dimension of Taqwa in numerous ways. Taqwa conveys a composite theological concept with very comprehensive meanings and high spiritual connotations. The Arabic word Taqwa implies a range of meanings including piety, salvation, deliverance, redemption, and emancipation. It can also mean fear of straying away from the supreme will of Allah (SWT) or falling short of reverential love for Allah (SWT) or not being able to ardently align ones soul with the divine commandments. Adoration of the Lord of the universe is the highest and humblest form of reverence and worship. Taqwa is the essence of relationship between human beings and Allah (SWT). The human race is admonished in Surah Al-Baqarah at Ayat 21 " O ye people! Worship your Guardian Lord, who created you, so that ye may become righteous (Muttaqi)".

The Holy Quran refers to Taqwa in many places and in many contexts. Similarly many Holy Hadis explain the significance of Taqwa on issue- specific and event-specific basis. The fear of Allah (SWT) , or God-fear, self-restraint, good-conduct, righteousness, and piety etc. feature all over theological literature in the context of elucidating the paramount spiritual significance of Taqwa. Essentially, Taqwa is a proactive concept. Viewed from another theological perspective, Taqwa can also be visualized as a defensive posture on the part of a devout traveller along the path of Allah (SWT). It is a defensive strategy against the vile onslaught and machinations of the accursed Iblis or Satan. Putting all these together one can say that the spiritual role of a Muttaqi is very challenging, comprehensive, and inclusive. Whatever a devout believer does , meditates, cherishes, practices, and strives for, to please Allah (SWT) will add up to his spiritual distinction as a Muttaqi. A Muttaqi not only himself strives along the path of Taqwa (piety) but also enjoins Taqwa for other believers. To distinguish between a rebel (Faseq) and a Muttaqi the Holy Quran poses a fundamental question, " ……. Or enjoins Taqwa (righteousness)". Surah Iqrah or Al-Alaq , Ayat 12. If one does, one is a Muttaqi. If not one is closer to a Faseq (rebel).

Relentless pursuit of Taqwa is encouraged and exhorted by the Holy Quran. In Surah Al-Imran at Ayat 102 the Holy Quran emphasizes,"O ye who believe! Fear Allah (Attaqullah) as He should be feared and die not except in the state of Islam." That implies the entire inner being should be permeated with the spirit and ideals of Islam. Not just in form but in real substance. Some broad but definitive parameters that profile a Muttaqi can be gleaned from Surah Al-Baqarah at Ayat 2 and Ayat 177. At Ayat 2 the Muttaqi is introduced as one having five attributes: (1) believing in the unseen, (2) establishing Salat, (3)spending from the Rizik (ie: material, intellectual, social, and spiritual bounties) bestowed by Allah (SWT), in the cause of Allah (SWT), (4) believing in the revelations conferred on the last Prophet Mohammad (Sllallahu Alaihe Wa Sallam, SAWS) , and all the prophets who were sent before him, and (5) having sure faith in the hereafter.

Once again a Muttaqi is described at Ayat 177 of the same Surah. Five qualities having very wide and holistic significance are articulated in this context : (1) to believe in Allah (SWT), and the Last Day, and the Angels, and the Divine Books, and the Messengers, (2) to spend for the sake of love for Allah (SWT), for kins, orphans, needy and the wayfarer etc., and (3) to be steadfast in prayer (Salat) and to pay Zakat and , (4) to fulfill all obligations that includes all obligations towards Allah (SWT) and commitments made with human beings) (5) to be firm and patient in pain and adversity. These attributes of a Muttaqi are more or less similar to the qualities enumerated at Ayat 2 above. Only items no 4 and 5 are additional.

These two Ayats of Surah Al-Baqarah eloquently describe the fundamental qualities of a Muttaqi in the context of two cardinal concepts of Islam, which are Haqullah (duties and obligations a believer owes to Allah (SWT), and Haqqul Ibaad duties and obligations in respect of all creations of Allah (SWT). A believer enters into a holy covenant with the Creator as he humbly recognizes the transcendental attributes and the Supreme Authority of Allah (SWT) and very willingly submits to the divine commandments laid down by the Holy Quran and the Holy Hadis. The same set of covenants also enjoins the full respect for the rights of all creations of Allah (SWT), including human-rights. We are looking here at the holistic aspects of Imaan (faith) and Amaal (practice). To begin with a Muttaqi must have unshakable faith (Imaan) in Allah (SWT), His Messengers, The Day of Judgment and all the Holy Books. The Muttaqi must devoutly practice the duties (Aamal) enjoined by Shariah (ie: the laws laid down by the Holy Quran and the Holy Hadis). A Muttaqi enjoins doing of good and forbids evil deeds. More description of a Muttaqi can be found in Surah Al-Lail at Ayat 5 and 6. “so he gives (in charity) and fears Allah,(Wattaqa). And (in all sincerity) testifies to the best”. The Muttaqi is distinguished here by three holy qualities: (1) devout sacrifices in the cause of Allah (SWT) and mankind (2) fear of Allah (SWT) which manifests itself in righteous conduct in pursuance of Taqwa, and (3) sincerity and honesty in supporting all that is morally commendable (Hasan). Consequently, a Muttaqi gets installed on the Sirat-al-Mustaqim (the straight path) with the help of divine grace and guidance of Allah (SWT). Owing to dedicated striving in the way of Allah (SWT), a Muttaqi may merit to be ranked in the company of those who are blessed by Allah (SWT) with success in this world and the world beyond.

Taqwa happens to be a common spiritual denominator for all the devout servants of Allah (SWT), male or female. According to the degree of excellence of Taqwa, spiritual ranking places the Prophets of Allah (SWT) at the highest level. The Holy Quran refers to a number of categories of exalted servants of Allah (SWT), including Siddiquns, Shaheedans, Saleheens, Mohsinin, and Abrar etc. These ranks have been referred to in somewhat interchangeable manner and all these have been generally linked to Taqwa in different contexts. In this sense Taqwa is the reference value for all spiritual advancements .In a generic sense all these categories of spiritual high-ups can be said to belong to the broad category of Muttaqin (a form of plural for Muttaqi). Depending on the quality of Imaan and Aamal of a Muttaqi, level of Taqwa may increase or decrease. Taqwa is thus a dynamic spiritual phenomenon and not a static spiritual state. A devotee of Allah (SWT) belongs to a particular exalted spiritual rank, at a particular point of time, contingent on the degree of excellence of Taqwa.

All the prophets of Allah (SWT) personified the summum bonum of Taqwa, with special grace and blessings from Allah (SWT). Surah Al-Ahzab opens with the Ayat that exorts, “O Prophet ! fear Allah (Attaqullah) and hearken not to the unbelievers and the hypocrites…..”. That quintessential level of Taqwa is beyond the ken of normal mortals. Average believers can aim at high level of Taqwa depending on soundness of Imaan and excellence of Aamal. In Surah Al-Huzurat at Ayat 13, Allah (SWT) declares, “ …. The most honored amongst you in the sight of Allah is the one who is most righteous (ie: Muttaqi). Again in Surah Al-Nahl we see at Ayat 128 a special emphasis on Taqwa, “For Allah is with those who restrain themselves (a special manifestation of Taqwa) and those who do good”.

Theological literature is replete with explanations, interpretations and elucidations about the nature, dimensions and manifestations of Taqwa. Many Islamic scholars explain Taqwa in terms of fear of Allah (SWT) or God-fear. Imam Gazzali enumerates four types of fear. First being the abject fear of unworthy people like cowards. The second type is the fear of immature and inexperienced people confronted by unknown threats. The third type is represented by rational response to evil to the point of overcoming it as a defensive overture. The noblest manifestation of fear is the reverential awe akin to love. It is the noble fear of things that may displease the object of love. The last type of fear is the fountainhead of Taqwa. A devout believer (ie: a Muttaqi) abjures all things that may displease Allah (SWT) or may in a way hinder the ascent of righteous soul towards higher ranks of spirituality .

Another set of manifestations of Taqwa includes guidance, self-restraint, guarding ones tongue, hands, eyes, and heart against evil and sin. In Surah Mohammad at Ayat 17, Allah (SWT) reminds,” But to those who receive guidance, He increases their guidance, and bestows on them their piety and restraint (Taqwa).” Again in Surah Al-Hashr at Ayat 18, Allah (SWT) admonishes, “ O ye who believe fear Allah (Attaqullah) and let every soul look to what (provision) it has sent forth for the morrow. Yea, fear Allah (Attaqullah), for Allah is well –acquainted with all that ye do.” The erudite interpreters of the Holy Quran explain these two Ayats to include guidance, self-restraint, eschewing evil, sin, injustice and doing positive good and righteous deeds for the benefit of own soul. Allah (SWT) is fully aware of what we do and even the thoughts we harbor deep inside our mind. Hence Taqwa is purity of thoughts and nobility of deeds on the part of a believer. From this perspective a Muttaqi is characterized by high level of righteousness, piety and good conduct.

A Muttaqi is always grateful to Allah (SWT) not merely in terms of words but also in terms of noble thoughts and pious deeds. In the context of battle of Badr, Allah (SWT) says: " then fear Allah (Tattaqun), thus may ye show your gratitude". Surah Al-Imran , Ayat 123. Here Taqwa signifies a noble means of showing gratitude to Allah (SWT). In every Raka of Salat we recite Surah Al-Fatiha, which starts with " Alhamdulillah", which is an expression of sincere gratitude to Allah (SWT) for all the opportunities and blessings that He has most graciously bestowed upon us.

A Muttaqi is one who has perfectly perceived and devoutly established the relationship between himself (a created servant) and his Creator, Lord, and Master. A Muttaqi makes it a life-long struggle to organize his earthly life and all thoughts, ideals, and activities in accordance with Shariah. His constant awareness about accountability on the Day of Judgment keeps the Muttaqi on the road to Allah (SWT). He establishes a spiritual balance between constant fear of overstepping the limits set by Allah (SWT) and enduring hope on Allah's (SWT), mercy, grace and forgiveness. A Muttaqi is ever conscious of the admonition, "Hold firmly to what We have given you, and bring (ever) to remembrance what is therein (ie: the Holy Quran); perchance ye may fear Allah". Surah Al- Aaraf, Ayat 171.

May Allah (SWT) give us the guidance to the way of meriting His grace, mercy, and blessings , so as to be able to order our life on the role-model of a Muttaqi.

Mufleh R. Osmany
Chairman, The Islamic Research Society Bangladesh
Member, Executive Committee, Gulshan Central Masjid & Iddgah Society
Former Ambassador and Foreign Secretary, Govt. of Bangladesh

ইতিহাসের আলোকে হারামাইন শরীফাইন

এ কে এম নূরুল ফজল বুলবুল

আদিপিতা হযরত আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে আসার আগেই মূলত বায়তুল্লাহর ভিত ফেরেশতাদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে: "মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মিত হয় তা বাক্কায় (মক্কার অপর নাম) অবস্থিত এবং এ গৃহ বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত ও বরকতের উৎস" (সুরা ইমরান:৯৬) বায়হাকীতে বর্ণিত: এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (স.) জানান: হযরত আদম ও হাওয়া পৃথিবীতে আসার পর আল্লাহ পাক হযরত জিবরাইলের মাধ্যমে কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। নির্মানের পর তওয়াফের আদেশ দেয়া হয়; বলা হয় আপনি সর্বপ্রথম মানব এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ-গোটা মানব জাতির জন্য যা নির্দিষ্ট করা হলো। (ইবনে কাসীর)

নুহ আলাইহিস সালামের মহাপ্লাবন পর্যন্ত কা'বা অক্ষত ছিল বলে হাদীস রয়েছে। প্লাবনে বিধ্বস্তের পর প্রকৃত প্রস্তাবে-মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম প্রাচীন ভিত্তির উপর কা'বার পুনঃ নির্মাণ করেন। (সুরা: হজ্জ) এভাবে একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কোরাইশরা এ গৃহ নির্মাণ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ্য যে, কা'বা গৃহ নির্মাণের ৪০ বৎসর পর জেরুজালেমে-বায়তুল মোকাদ্দাস হযরত ইবরাহিমের হাতেই সম্পন্ন হয়। অবশ্য হযরত সুলায়মান (আঃ) এটা পুনঃ নির্মাণ করেন। (সূত্র: মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা)

খাতামুন আম্বিয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫৭০ ঈসায়ী সালে মক্কায় মুহাম্মদ (স.) নামে জন্মের বছরই-কা'বা আক্রমণের ইতিহাসখ্যাত হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। (সূত্র: ইবনে কাসীর) আসমানী আযাব দ্বারাই হস্তিবাহিনী মক্কার ৫ কিলোমিটার দূরে মিনায় প্রতিহত হয়। (১০৫:৫) মশহুর হাদীস বিশারদগণ ঘটনাটিকে নবী আলাইহিস সালামের মোজেযা হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। এ ঘটনায় সমগ্র আরবের অন্তরে সমগ্র কোরাইশদের মাহাত্ম্য আরো বেড়ে যায়। সকলেই বুঝলো যে আল্লাহ পাক স্বয়ং একঝাঁক পাখি দিয়ে ইয়েমেনের শক্তিশালী রাজশক্তিকে কোরাইশদের পক্ষ থেকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। (কুরতুবী)

৫৯৫ সালের দিকে কা'বার মুতুয়াল্লী হিসেবে কোরাইশরা স্থির করলো-তারা পবিত্র গৃহ (কা'বার) যথোপযুক্ত সংস্কার করবে তাদের উপার্জনের হালাল অংশ দিয়ে। হালাল অর্থে একাজ করতে গিয়ে মূল কা'বার পুরো অংশ তাঁরা নির্মাণ করতে না পেরে কিছু অংশ ঘেরাও দিয়ে সংরক্ষিত করে বর্তমানে বিদ্যমান অংশটুকুই তারা সমাপ্ত করলো। এছাড়া ইবরাহিমী নির্মাণে কা'বার দরজা দুটো ছিল। একটি কেবল প্রবেশের অপরটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হবার। কিন্তু কোরাইশদের নির্মাণে পূর্বদিকের একটি দরজা রাখা হয়। এছাড়া তারা সমতল থেকে দরজা অনেক উচুতে-নির্মাণ করে-প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করতো। উল্লেখ্য যে, ঘেরাও দেয়া অংশটুকু মূল কাবার অংশ যা বর্তমানে হাতিম হিসেবে অভিহিত। নবুয়তের আগের এ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় হুজুরপাকও (স.) শরীক ছিলেন। এবং তিনিই "হজরে আসওয়াদ" স্থাপনের সূত্র ও কৌশল কোরাইশদের বাতলে দিয়েছিলেন। নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে এ প্রসঙ্গে মা আয়েশাকে (রাঃ) বলেছিলেন: আমার ইচ্ছা হয় কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে ইব্রাহিমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু নও-মুসলিম অজ্ঞলোকদের মনে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কায় বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। এ কথাবার্তার অল্পদিন পরেই দুনিয়া থেকে তিনি বিদায় নেন।

হযরত আয়শা (রাঃ) ভগ্নিপুত্র মশহুর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ) মক্কার প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে (৪০ হিজরীর পর) মহানবীর (সাঃ) ইচ্ছার প্রতি সন্মান জানাতে হাতিমের অংশটুকুও মূল কা'বা ঘরে সংযোজন করে দেন। কিন্তু উমাইয়া শাসনে (হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ-মক্কার কর্তৃত্ব নিয়ে) কা'বাকে বর্তমান অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। এদের যুক্তি ছিলো যেহেতু নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এভাবে দেখে গেছেন সেহেতু এভাবে বহাল রাখাই কর্তব্য। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর অন্যান্য শাসনামলে হাদীস দৃষ্টে কা'বা গৃহ ভেঙ্গে ইব্রাহিমী নির্মাণের অনুরূপ ইচ্ছা ও উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু মদিনায় বসবাসরত মশহুর ইমাম-হযরত মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) তখন ফতোয়া দেন যে এভাবে ভাঙ্গাগড়া অব্যাহত থাকলে খুবই খারাপ উদাহরন হয়ে যাবে। এবং কা'বা গৃহ শাসকদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। অতএব; বিদ্যমান অবস্থাই বজায় থাকুক। আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ গোটা মুসলিম সমাজ এ ফতোয়া তথা ইজমা গ্রহন করে নেন। যদিও ছোট-খাটো মেরামতের কাজ সব আমলেই অব্যাহত থাকে।

কা'বার গিলাফের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। মক্কা বিজয়ের আগে গিলাফের (কাপড়ের কভার) প্রচলন ছিল না। নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ইয়েমেনী গিলাফ পরিয়ে ছিলেন। খলিফাতুল মুসলিমীনত্রয় (হযরত আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও ওসমান (রাঃ) ইজিপশিয়ান সাদা কাপড়ের গিলাফ তাদের সময়কালে তৈরী করেছিলেন। (সূত্র: হিস্ট্রি অব মক্ক-দারুস্সালাম, (জেদ্দা)। বছরে দু'বার এটা পরানো হতো-আশুরা ও রমজানে। বর্তমানে আরাফাহ দিবসের আগের দিন ৮ই যিলহজ গিলাফ পরানো হয়। যা খিশা নামে অভিহিত। ৬৫৮ বর্গ মিটারের এ গিলাফে ১২০ কেজি স্বর্ণ এবং ৫৭০ কেজি রূপা ব্যবহৃত হয় অঙ্গবিন্যাসে। যাতে খরচ হয় ১৭ মিলিয়ন রিয়াল।

খুবই ছোট সীমানা নিয়ে মসজিদুল হারাম বিদ্যমান ছিল। সর্বপ্রথম ১৭ হিজরীতে খলিফা ওমর (রাঃ) আশেপাশের কিছু বাড়ী কিনে এবং কিছু বাড়ী সরকারী অধিভুক্ত করে এই সীমানা বৃদ্ধির উদ্দ্যোগ নেন। এভাবে চলতে থাকে বর্ধিত করনের কর্মসূচি। হযরত ওসমান (রাঃ) ২৬ হিজরীতে কিছু কাজ করেন। পরবর্তীতে মক্কার শাসক হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) ১০,০০০ বেশী দিনার দিয়ে পূর্বাংশ বাড়ানোর প্রকল্প হাতে নেন। এভাবে আব্বাসীয় যুগে-উমাইয়া শাসনে, মিসরীয় সম্রাটের সময়ে, তুর্কী খেলাফতকালে সম্প্রসারণ অব্যাহত থাকে। বর্তমান সৌদি যুগে মূলত মসজিদুল হারামের ব্যাপক সম্প্রসারণ সাধিত হয়। মসজিদের মূল অংশ দুইলক্ষেরও বেশী বর্গমিটারে উন্নত করা হয়-৫১টি নতুন দরজাসহ। বলা হয় এখন শুক্রবারে বা কোন বিশেষ দিনসমূহে প্রায় পঁচিশ লক্ষ মুসলী এক ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করেন।

হাদিসে পাকে বায়তুল্লাহর বহু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে যা এ পরিসরে বলে শেষ করা যাবে না। এক ছহীহ হাদীসে মশহুর সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান: মহান রাব্বুল আলামীন তার সন্মানিত ঘরের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের জন্যে প্রতিদিন ১২০টি রহমত নাযিল করে থাকেন-যার ষাটটি তওয়াফকারীদের জন্যে-চল্লিশটি নামাজ আদায়কারীদের জন্যে এবং বিশটি আল্লাহপাকের পবিত্র ঘরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধকারীদের জন্য। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন মক্কায় এক দিনের রোজা মক্কার বাইরের এক লাখ রোজার সমান এবং কেবলমাত্র একটি নেকী এক লাখ নেকীর সমান। সহীহ ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিখ্যাত সেই হাদীসটি বর্ণিত: যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলে গেছেন: কেহ ঘরে নামাজ পড়লে এক গুণ-মহল্লার মসজিদে পঁচিশ গুণ- জামে মসজিদে ৫০০ গুণ-আর মুসজিদুল আকসা ও মসজিদে নববীতে নামাজ পড়লে ৫০ হাজার গুণ এবং মসজিদুল হারামে অর্থাৎ কা'বা ঘরে পড়লে একলাখ গুণ বেশী সওয়াব পাবে। আল্লাহপাক সবাইকে বায়তুল্লাহর জিয়ারত নসীব করুন। কেননা যে পাঁচটি বুনিয়াদের উপর ইসলামের মৌলিক ভিত্তি- হজ্জ তার অন্যতম। পবিত্র কোরআনে নির্দেশ এসেছেঃ- "আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ্জ অপরিহার্য, যার সেখানে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রয়েছে"।

হাদিসে এসেছে হিজরত ও হজ্জ পূর্বের সকল গোনাহ মোচন করে দেয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে নবী আলাইহিস সালামের একটি জোরদার নিষেধ বাণী তুলে ধরা উচিত। এক সহীহ হাদিসে তিনি বলেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভমূলক সফর কেবল তিনটি পবিত্র মসজিদ যিয়ারতের জন্য করা যাবে। তা হচ্ছে মহান কাবাঘর-মসজিদে নববী ও মসজিদে আকসা। এছাড়া দুনিয়ার কোথাও সফর আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে করা জায়েজ নয়। এ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদ বা পবিত্রস্থান সফর মানত করা শুদ্ধ হবে না-ওয়াজিবও নয়। এমনকি খোদ সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) শুধু কোন নবীর মাযার যিয়ারতের সফর করেছেন বলে প্রমাণ নেই। আলোচ্য নিষেধ হচ্ছে শুধু মানত করা নিয়ে কেবল এ উদ্দেশ্যে বিশেষ সফর করা নিয়ে। আর নিয়তের উপরই যে কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল তাতো বুখারী শরীফের প্রথম সহীহ হাদীসেই বর্ণিত রয়েছে।

মসজিদুল নবী

নবুয়ত লাভের পর একযুগ পর্যন্ত মক্কায় নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের সমূহ লাঞ্ছনা-নির্যাতনের মুখেও ইসলাম প্রচারে নিবেদিত ছিলেন। কাফের-মুশরিকরা মহানবীকে (সাঃ) হত্যার চক্রান্ত চূড়ান্ত করলে তিনি ইয়াসরিবে (মদীনার তদানিন্তন নাম) ৬২২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর হিজরত করেন। প্রিয় সাহাবা হযরত আবু বকরকে (রাঃ) সাথে নিয়ে মদিনার সন্নিকটে কুবা গ্রামে সর্বপ্রথম (বনি আউফ গোত্র) তিনি তাশরিফ (১৪ রাত) আনেন। এখানে তিনি একটি মসজিদও নির্মাণ করেন- যা আজও কোটি মুসলমানের প্রিয়তম তীর্থ। বস্তুত ইসলামের আবির্ভাবের পর এটি মুসলমানদের প্রথম মসজিদ। এখানে দু'রাকাত নামাজের সওয়াব একটি ওমরাহর সমতুল্য। এছাড়াও মদিনার উত্তর পশ্চিমে রয়েছে মসজিদে কিবলাতাইন। আছে খন্দকের স্মৃতিবিজড়িত বিজয়ের ৫টি মসজিদ। বহু আনসার কর্তৃক অনুরোধ্য হয়ে মদীনায় নবীজী (সাঃ) কোথায় উঠবেন- এ সিদ্ধান্ত তিনি তাঁর উটের উপর ছেড়ে দেন। আইয়ুব আনসারীর (রাঃ) বাড়ীর পাশে উট বসে পড়লে তিনি এখানেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। সংক্ষেপে মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস হলো: আসাদ বিন জুবাইর এর তত্ত্বাবধানে পালিত মদিনার দুই এতিম বালক সাহাল এবং সুহাইয়েল মসজিদের মূল জায়গাটি প্রদান করেন। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী নবী আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে হযরত আবু বকর জায়গা বাবদ ৪০০ দিরহাম প্রদান করে। তবে এমতেরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে ঐ দুই মহান এতিম অর্থ গ্রহন করেননি।

মসজিদের প্রতিষ্ঠাকালীন আয়তন ছিল প্রায় ২৫০০ বর্গমিটার। হযরত ওমর (রাঃ) এর আমলে ইসলামের ব্যাপক প্রসারকালে তিনি ১৪ হিজরীর পর মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ করেন। এবং ২৪ হিজরীতে হযরত ওসমান (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলে ১০ মাসের মধ্যে (২৯ হিজরী) মসজিদের ব্যাপক সম্প্রসারণ করেন। পরবর্তীতে ওমর বিন আব্দুল আজিজের মদিনাস্থ গভর্নর আল ওয়ালিদ ৮৮ হিজরীতে সম্প্রসারণের কাজে হাত দেন। এবং তখনই চারটি মিনার নির্মিত হয়। এভাবে প্রতিটি শাসনামলেই মসজিদের সম্প্রসারণ হয়। আব্বাসী, উমাইয়া, মিসরী সম্রাট-তুর্কী খলিফা হয়ে বর্তমান সৌদী শাসনামলে সম্প্রসারণ চূড়ান্ত পর্যায়ে লক্ষাধিক স্কয়ার মিটারে পৌঁছেছে। বলা হয় মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ এক সময় ওহুদ পাহাড় পর্যন্ত ঠেকবে। মর্তমানে ১০ লক্ষাধিক মুসল্লি একসাথে ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারে। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের থেকে মদিনার সামগ্রিক পরিবেশ ও পরিবেশনার পার্থক্য মুমিনের হৃদয়কে করে আপ্লুত-সমগ্র জগৎকে করে পবিত্র। রহমাতুল্লিল আলামীন সোনার মদীনার পবিত্রতম রওজা শরীফ থেকে নিসলসভাবে প্রিয় উম্মতের জন্য কাঁদেন-তাঁর মাহবুব রাব্বুল আলামীনের দরবারে । বষণন করেন রহমতের অবিনাশী পবিত্রতম ফল্গুধারা।

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, এক্সিম ব্যাংক, এফবিসিসিআই এবং সিডিবিএল
জেনারেল সেক্রেটারী, ইসলামিক রিসার্চ সোসাইটি বাংলাদেশ

Islam- A Realistic Interpretation

Muhammad Zafor

Islam is not a religion in the ordinary sense of the term. Normally religion means strong belief in some fundamentals, with prescription to practice some rituals but without any well defined guidelines to be followed in practical life. On the other hand Islam is a comprehensive concept incorporating both fundamental beliefs and a code of complete life. If religion is translated in Bengali as 'dharmo' meaning basic characteristics of a matter, then Islam can be considered as a religion having such basic characteristics unique to itself. We can say that 'dharmo' of fire is to burn, ' dharmo' of air is to blow, and 'dharmo' of water is to flow, so 'dharmo' of man is to act according to the basic characteristics with which he is created which is called in Islamic theology as ' fitrat' and so named in the holy 'Quran'. In this sense Islam can be defined as a philosophy based on some fundamental beliefs aimed at protecting the 'fitrat' and promoting the bond of relationship with the Creator and His creation for achieving welfare in this world and salvation ('najat') in hereinafter ('akhirat').

In western perception, man is primarily conceived as selfish, brute and sin incarnate. Existing Christian philosophy holds that by having faith in Christ one can come out of the state of born sinner. But Islam says that man is born with some good qualities and proper guidance will enhance his chances to remain in the right path. The objectives of practicing prescribed 'Ibadat' (rituals like ' Salah', ' Zakah' , 'Siam' and ' Hajj') and following right 'Muamalat' in day to day life, are to protect and promote those basic qualities. In a 'hadith' our beloved prophet (puh) said "Every child is born with good qualities known as 'fitrat', but his parents (society) misguide him and lead him to the wrong track of 'Zudaism' or 'Christianity' or 'Fire Worshipping'". Basic fundamental good qualities of a man are- to have faith in the Creator, maintain brotherly relations with men and other units of creation. 'Ibadat' are aimed at strengthening relations with the Creator while 'Mualmalat' are aimed at improving relations with men and other units of creation.

Relations with the Creator

The word Islam means –to surrender. It is derived from the basic term of 'Silm' or 'Salam' meaning peace. In Islam one surrenders to the will of the Creator – Allah, in order to achieve peace in both worlds. So, journey in Islam begins with strong faith in Almighty Allah and surrendering to His will. The practical manifestation of this faith is to abide by His orders in every sphere of life as revealed through the Prophet Muhammad (pub), collectively called 'Shariah'. 'Shariah' has two branches- 'Ibadat' and 'Muamalat' – the former meaning all rituals as practical demonstration of obedience to the Creator, and the latter showing the methods of behaving with fellow human beings and the society.

Through the practice of regular 'Ibadat' one can truly establish direct link with Almighty Allah and thereby gradually can arrive at a spiritual stage when feels His existence. Islam believes, and rightly so, that a creation can not prove the existence of the Creator by placing reasons and arguments, howsoever strong those might be. Of course one can feel Its existence by practicing 'Ibadat' in such form and sequence as has been prescribed with full concentration and withdrawing the mind for the time being at least from all other things and powers that possess the human mind. For this reason Islam has a prescribed method of direct worship without any other media to intervene in between. In a 'Hadith' the Prophet (pub) said "Worship your Lord as if your are looking at him, if you can not see him, He surely sees you". In another 'Hadith' it is stated that "Salah (Regular five times prayer) is the 'Miraj' (journey to heaven to contact Allah) of every believer". Prophet (pub) had direct contact with the Almighty Allah during his 'Miraj'. So, every believer can attain similar position during 'Salah'. When a man attains that high level of spiritual standard, he always feels the presence of the Creator around him and naturally refrains from all kinds of evil doings and bad practices. This perpetual fear of Allah that protects him from wrong path is called 'Taqwa'. Consequently a 'Muttaqi' possesses the qualities of a good citizen needed to build a prosperous and peaceful society. Such a person is assured of 'Najah' after death and 'falah' (welfare and success) before it.

Relations with man and other units of creation

The unique characteristics of Islam is its all comprehensive nature. It prescribes the method of having faith in the Creator and also maintaining good relations with man and other units of creation. The fundamental principle in this respect is the concept that man and other units of creation are created with some very basic characteristics, the crux of which is surrendering to the will of the Creator. In the holy 'Quran' it is clearly stated that "Seven skies, the earth and whatever is there in between them are engaged in glorifying Him (Tasbih) and everything in this universe is constantly praising Almighty Allah, though you do not understand this"(Verse-44,Surah-17). The only difference is the fact that man is given the freedom to remain on the same line with other units or deviate from it. The system of 'Ibadat' and 'Muamilat ' in Islam are designed in such a way that ensures protection of surrendering value of human beings so that they remain on the same wave length with other units of creation. This natural way of practicing Islam is called 'Deen' in the holy Quran. In the holy 'Quran' Almighty Allah mentioned clearly " Establish your face towards the correct 'Deen' (which is based on the nature). The nature with which man has been conditioned. There is no change in the creation of Allah. That is the strong 'Deen' "(Verse- 30, Sura-30) If the harmonious relations with the Creator and the creation is maintained, then everywhere peace will prevail. If not, then there will be chaos and conflict termed in the holy 'Quran' as 'Fasad'.

In a verse of the holy 'Quran' it is openly declared that every other parts of this universe are following the path of 'Deen' and man in ultimate analysis cannot go the other way. In the words of the holy 'Quran' "Do they want to have a way outside the 'Deen' of Allah, while everything else in the sky and the earth has surrendered to Him willingly or unwillingly and all will return to Him" (Verse- 83 , Surah-3). In another verse the holy ' Quran' declared that "There appeared chaos and 'fasad' in the land and the sea due to some practices of man" (Verse-41, Surah-30). So, it is clear that Islam prescribes a method of actions that ensures harmonious relations with Creator and creation. However, creation consists of two organs- Man and other Units. Islam has wide provisions of having good relations with man which can be termed as 'Social brotherhood" . It also asked man to maintain proper relations with other units of creation which may be described as 'Natural Brotherhood'. For social brotherhood Islam prescribes some common rights for all irrespective of religious belief. In a 'Hadith' Prophet (puh) said "Allah assists the man so long he assists his brother". Islamic injunctions to respect rights of the neighbours are also not based on religious consideration. For 'Natural Brotherhood' there are particular guidelines to respects rights of animals, vegetation and other creation. In the holy 'Quran' destruction of vegetation has been condemned in equal term with destruction of animal. Verse 205 of Surah 02, it is said "When they get power they start moving in the society, creating disorder by way of destroying vegetation and animals. Allah does not like disorder". In a 'Hadith' the Prophet (puh) said " Entire creation is the family of Almighty Allah".

Spiritual and social bearings of Islamic Rituals

Islamic fundamentals as explained above lead to the protection and promotion of basic human qualities that transform an individual into an ideal man. A society consisting of such individuals will be free from all kinds of evils. It will also ensure protection of bio-diversity and sustainable development by having smooth relations with all units of creation (nature). A man imbued with Islamic values will be dutiful to the Creator and His creation at the same time. He will be mindful about rights of fellow human beings and other units of creation simultaneously. He will have peace in this world and also hereinafter. In this way true objectives of Islam will be realized. Unfortunately, the preaching and understanding of Islam in our society is not on its right track. Most of us consider Islam as a tool only for personal salvation after death forgetting its bearing for others and the society.

Islam is based on five fundamental pillars – unflinching faith in the existence of Almighty Allah and Prophethood of Muhammad (pbuh), ' Salah', 'Zakah', 'Siam' (Fasting) and 'Hajj'. The famous 'Hadith-e- Jibril' explained it very clearly and loudly. These rituals have manifold objectives, both spiritual and social. But in most of the cases these rituals are performed only for narrow goal. We say prayers only for our own benefits ignoring its role as a method of attaining that high spiritual standard that will enable him to have a direct link with the Creator and transforming him into a fruitful and beneficial member of the society. At that level 'Salah' will prevent a man from unpleasant and indecent actions (' munkar) as mentioned in the verse- 45 of Surah-29. On further elevation one can use 'Salah' as a means to get all kinds of help from Almighty Allah. In the holy 'Quran' it is stated "Seek assistance of Allah by 'Salah' and patience –'Sab'r' (Verse-45, Surah-2). On more elevation across spiritual journey one feels a kind of enjoyment by joining prayer and other rituals. The Prophet (puh) said in a 'Hadith' "the prayer is cooling for my eye".

In the same way we observe 'Siam' (fasting) only to gain good rewards (Sawab) from Allah on the day of judgment. We forget that 'Siam' is an excellent method of coming closer to Almighty Allah and serving suffering humanity by sharing their pains and providing solace to them in various ways. Our beloved prophet (pub) described it as a month of patience and sympathy. He also mentioned that "a man who does not left bad practices and telling lies during Ramadan, his leaving of food and drink does not carry any meaning to Allah". Fasting makes one closer to the Angels who do not take food and also are free from all kinds of evil and sinful activities.

'Zakah' is another important basic pillar of Islam. Its meaning is – to increase and to purify. By paying' Zakah' wealth becomes pure from the dirt associated with normal business and worldly activities. It also purifies the soul from the sins connected with spending more time in earning wealth than remembering Allah –'Jikrullah'. This is the main objective of the institute of 'Zakah'. Poverty alleviation and assisting the needy, are its bye products. Because if a man is purified he will always try to help others in various ways payment of 'Zakah' included. Putting much importance on its economic aspect, makes it only a tool for achieving a limited goal. From another point of view, Zakah, is not a poor tax aiming at poverty alleviation only. Its real function is to remove the personal and social hurdles that slow down the pace of economic activities. Six heads out of eight heads of 'Zakah' clearly explain this aspect. It is a lubricant that keeps the wheels of economy running by cleaning them from different types of dirt which gather in the way of its progress.

Hajj is also one of the main pillars of Islam. It does not have any rigidly prescribed rituals except –'Ihram', 'Tawaf' and 'Stay at the Arafah. Its sole objective is to present oneself before Almighty Allah uttering the words- 'Labbaik' – I am present before you. It is the highest manifestation of the spiritual journey on earth and attainment. It makes one admit that he has left all worldly possessions and has arrived at the door of the Creator. This feeling of closeness makes one a perfect Muslim and a fully qualified man to be true servant of Allah and the society. In a 'Hadith' it is stated that "a man who performs 'Hajj' correctly, returns home with all his sins forgiven, just like a new born child". So, he takes a fresh vow to start a new life of a person devoted to the cause of the Creator and His creation. Most of us do not look into 'Hajj' from its real perspective and rather made it a

journey for pleasure and spending extra wealth gained by various means – legal and illegal.

In this way every prescribed ritual is an effective mechanism of establishing direct link with Almighty Allah and attaining very high spiritual position which ultimately makes a man full 'Muttaqi' and good human being. Gaining good reward (Sawab) and 'Jannat' will be there as basic benefit. But focusing only on this aspect deprives us of its full benefit.

Islam as a Complete Code of Life or a Code of Complete Life

Very often we say that Islam is a Complete Code of Life. It appears to me that it is partially true not fully. It means that if one does not follow Islam, he can somehow leave in this world as his final suffering will be after his death. But in reality one cannot have any meaningful life without following Islam even in this world. Because Islam and life are synonymous considering the fact that one cannot have a life outside the domain of divinely fixed path. The message of verse No-83 of Surah-3 is clear in this respect. The verse No-179 of Surah-7, describes a man not following Islam – worst than the animals. So, deviating from Islam means deviating from true vision of life.

Former Ambassador and Director General
Ministry of Foreign Affairs, Govt. of Bangladesh
Adviser/Pro-VC, Royal University, Banani, Dhaka.

তাকওয়া ঃ (বা আল্লাহ ভীতি)

সৈয়দ রেজাউল করিম

"ইন্না আকরামাকুম এন্দাল্লাহে আতকাকুম"- অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ'র দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত হলো ঐ লোক যে তাকওয়া অবলম্বন করে।" (সূরা আল হুজুরাত)

তরিকত বা আধ্যাত্মিক পথের চালিকাশক্তি হিসাবে আমরা যে দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছি তা হলো এক, আখলাক এবং অপরটি 'তাকওয়া'। সূফী সাধনার পথে 'তাকওয়া' একটি অবিচ্ছেদ্য পরিচ্ছদ। হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) বলেছেন-(মনিহাজুল আবেদীন) "তাকওয়া উঁচু পর্যায়ের এবাদত এবং উত্তম সম্পদ বিশেষ। তাকওয়া অবলম্বনের ব্যাপারে যে সাফল্যমন্ডিত হবে। সে লাভ করবে উত্তম নেয়ামত, অতুল সম্পদ, মহান সম্মানের চাবিকাঠি, বিপুল ঐশ্বয্যের সম্ভার, বিরাট সম্রাজ্যের আধিপত্য এবং সকল বৈভব।"

পবিত্র কোরআন 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীকে আল্লাহ'র দৃষ্টিতে সবচেয়ে "অভিজাত" বলে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ'র যারা বন্ধু, যারা "আউলিয়া" তারাই তো অভিজাত। সূফীদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই আভিজাত্যের অংশীদারী হওয়াই তাদের সাধনা।

'তাকওয়া' শব্দটির বিভিন্ন অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা এসেছে। আল্লামা ইউসূফ আলী তাঁর ইংরেজি অনুবাদে বলেছেন 'Restrain' বা সংযত থাকা। 'আল-রিসালা-আল-কুশাহরীয়ার' অনুবাদক রাবিয়া হেরিছ এর অনুবাদ করেছেন, "আল্লাহ'র ভীতি"। থমাস প্রেস্টিক হিউজ "ডিকশানারী অব ইসলাম" বইতে এর অনুবাদ করেছেন। 'Abstinence' বা সংযম। কোরআনের বাংলা অনুবাদে এসেছে "পরহেজগারী"- 'খোদা-ভীতি'। "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন যারা 'পরহেজগার' এবং যারা ভাল কাজ করে।" [পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে, অন্তর্নিহিত অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, কোরআন শরীফে সূরা নাহালের ১২৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন যারা পরহেজগার এবং যারা সৎকর্ম করে" (অনুবাদ মাওলানা মহীউদ্দীন খান) আরবীতে "ইন্না আল্লাহা মা' আল্লাজিনা আত্তাকু ওয়াললাজিনা হুম মুহসেনুন"। মার্মডিউক পিকথল যিনি ইংরেজীতে কোরআন অনুবাদ করেছেন, তিনি এই আয়াতটির অনুবাদ করেছেন এভাবে, "Lo ! Allah is with those who keep their duty unto Him and those who are doers of good". আল্লামা ইউসূফ আলী অনুবাদ করেছেন এভাবে "For Allah is with those who restrain themselves and those who do good." বাংলায় যে শব্দটি 'পরহেজগার' হিসাবে ব্যবহারিত হয়েছে তা হলো ফার্সী শব্দ, 'পরহেজ' বা নিবৃত বা দূরে থাকার অর্থে।

আমরা শুরুতে সূরা হুজরাতে ১৩নং যে আয়াতটি উল্লেখ করেছি তার ইংরেজি অনুবাদ এসেছে এভাবে, "Lo ! the noblest of you in the sight of Allah is the best in conduct". (পিকথল) আবার আল্লামা ইউসূফ আলীর অনুবাদে "The most honoured of you in the sight of Allah is (he who is) the best righteous of you" এখানেও বাংলা অনুবাদে 'তাকওয়া' শব্দের অর্থ এসেছে "পরহেজগারী"।

আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই শাব্দিক বিভিন্নতার ইতি টানা হবে। সূরা 'নিসা'র ১৩১ নং আয়াতের 'তাকওয়ার' অনুবাদ ইংরেজিতে পিকথল করেছেন এভাবে "duty towards Allah." বাংলায় এরই অনুবাদ হয়েছে "আল্লাাহ'র ভীতি"।

"তাকওয়ার" বিভিন্ন শব্দার্থের অনুবাদ হলেও আমরা ধরে নিতে পারি এর প্রত্যেকটি একক এবং সমষ্টিগতভাবে 'তাকওয়ার' অন্তস্থ ধারণাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। কোন একটি মাত্র শব্দ অনুবাদ হিসাবে আল্লাহ'র উচ্চারিত শব্দ 'তাকওয়ার' গভীরতা, ব্যাপ্তি ও নির্যাসকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। কারণ, মানুষের জ্ঞানের বা আকলের সীমাবদ্ধতা আছে।

তাকওয়ার অবস্থান, প্রার্থনা বা এবাদতের মর্যাদার সিঁড়িতে অতি উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় 'তাকওয়া' শব্দটি এসেছে। আল্লাহ'র সন্তুষ্টি, ভালবাসা, নৈকট্য ও সম্মান অর্জনে 'তাকওয়ার' তাৎপর্য বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। যে সকল সূরায় কোরআনে 'তাকওয়া' উলেখ করা হয়েছে তা হলো, সূরা ইমরান/১৮৬, আল-নাহাল/১২৮, আল-তালাক/২৩, আল-আহজাব/৭০, আল-তাওবা/৪, আল-মায়েদা/২৭/৯৩, আল-হুজারাত/১৩, আল-ইউনুছ/৬৩, আল-নিছা/১৩১।

পবিত্র কোরআন থেকে দু' একটি উদ্ধৃতি 'তাকওয়ার' মর্মার্থ বা বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার কাজে সহায়তা করবে। প্রথমেই সূরা মায়েদার ৯৩নং আয়াতটির অনুবাদ এসেছে এভাবে, "যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে (এ নিষেধাজ্ঞা জারির আগে) তারা যা কিছু খেয়েছে, তার জন্য কোন গুনাহ নাই; (হ্যাঁ ভবিষ্যতে) যদি তারা সাবধান থাকে, (আল্লাহ'র উপর) ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, অতঃপর (আল্লাহ তায়ালার নিষেধ থেকে) তারা সতর্ক থাকে (একইভাবে যতক্ষন পর্যন্ত) তারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, অতঃপর

আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে ও সততার নীতি অবলম্বন করতে থাকবে (আল্লাহতায়ালা অবশ্যই তাদের ক্ষমা করে দেবেন,) কেননা আল্লাহতায়ালা সৎকর্মশীল মানুষদের ভালবাসেন।"

উক্ত আয়াতে 'সংযত' ও 'সততা' প্রায় একই সমার্থক। আল্লামা ইউসূফ আলী তাঁর ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'আমি তোমার সাথে আছি।' এই অর্থে আল্লাহ'র সান্নিধ্য অর্জন করা পুণ্যবান লোকের সর্বোচ্চ আশার সীমা'। সূরা হুজরাতের যে আয়াতটি উপরে উদ্ধৃত হয়েছে (তোমাদের মধ্যে আল্লাহ'র দৃষ্টিতে সবচেয়ে সম্মানিত হলো ঐ লোক যে তাকওয়া অবলম্বন করে।) তাতে তাকওয়া অলংকৃত 'মানুষকে আল্লাহ' মহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। আভিজাত্যের দাবি, আল্লাহ'র কাছে তাঁরই আছে যিনি মুত্তাকী যিনি তাকওয়ার চাদরে আবৃত, শারীরিক এবং মানসিক দুই জগতেই।

তাকওয়া অর্জনকারী ব্যক্তির যে সুমহান মর্যাদা পবিত্র কোরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই তাকওয়ার বাহ্যিক এবং ভেতরের রূপ একটু অনুধাবনের প্রয়োজন আছে। হাদীস শরীফ, সূফীদের জীবন চর্চা এবং ব্যাখ্যাকারীদের ব্যাখ্যা হতে এর স্বরূপ নির্ণয় করা যেতে পারে। সূরা ইমরানের ১০২ নং আয়াতে পবিত্র কোরআন বলছে, "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ'কে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

তাকওয়ার বিভিন্ন বাস্তবতা আছে। তার মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের তাকওয়া হলো শিরক থেকে বেঁচে থাকা। "তাকওয়া আনিল শিরক" (আল্লাহ'র সাথে কাউকে একই মর্যাদায় বসানোর শিরক হতে তাকওয়া) 'তাকওয়া আনিল বিদায়াৎ" (প্রচারিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে সব রকমের নতুন প্রথা প্রবর্তন ও ধর্মীয় ভিন্নমত হতে তাকওয়া এবং ছোট ছোট গুনাহ বা পাপ হতে তাকওয়া।

হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ শাফী (রহঃ) কর্তৃক কোরআনের যে তফসীর মাওলানা মহীউদ্দীন খান সাহেব অনুবাদ করেছেন তাতে বলা হচ্ছে-

তাকওয়া-"দ্বিতীয় স্তর যা আসলে কাম্য- তা হলো এমন সব বিষয় হতে বেঁচে থাকা যা আল্লাহতায়ালা ও তাঁর রাসূলের পছন্দীয় নয়। কোরআন ও হাদীসে তাকওয়ার যে সব ফজীলত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের তাকওয়ার উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়া সর্বোচ্চ স্তর। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের উত্তরাধিকারী ওলীগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ অন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহ'র স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা।"

'তাকওয়ার' হক বা দাবি কি ? এর উপর ব্যাখ্যা রাখতে গিয়ে উক্ত তফসীরকার আরো বলেছেন, "এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ, রবী কাতাদাহ ও হাসান বসরী (রঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) হতেও এমনি বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হলো প্রত্যেক কাজে আল্লাহ'র আনুগত্য করা আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখা-কখনো বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা- অকৃতজ্ঞ না হওয়া।

তাকওয়ার হকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরকারী আরো বলেন, কোরআনে এসেছে, "সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর।" হযরত ইবনে আব্বাস ও তাউস বলেন, এ আয়াতটি তাকওয়ারই হকের ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে পূর্ণ শক্তি দিয়ে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

উপরে 'শিরক' এর অর্থ করা হয়েছে, " আল্লাহ'র সাথে কাউকে সমমর্যাদায় বসানো।" এই শিরকের আবার চার রকমের চরিত্র আছে। মানুষ অনেকটা অসাবধানতাবশত অনেক উচ্চারণ করে যা শিরকের পর্যায়ভূক্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রথমতঃ "শিরকুল ইলম"-এই শিরকের অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে জ্ঞানের আধার বা উৎস মনে করা। "শিরকুল আছাররূফ"- আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ক্ষমতার অধিকারী বা উৎস মনে করা। শিরকুল ইবাদা, সৃষ্টি জীবের আরাধনা বা পূজা করা। "শিরকুল আদাহ"- এমন সব উৎসব অনুষ্ঠানাদি করা যাতে করে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভরতা করা বুঝায়। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয় যেন কথায় ও কাজে 'শিরক' ও 'কুফর' এর কোন কালিমা যেন তাকে স্পর্শ না করে। এই চরিত্রের যাঁরা অধিকারী তারা 'মুত্তাকী' মুসলমান হিসাবে পরিচিত হবেন। যদিও তিনি অন্য কোন ছোট গুনাতে লিপ্ত থাকেন। তবে এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, এটি হলো তাকওয়ার নিম্নতম স্তর।

ইসলামের মহান জ্ঞানী সূফী তাপস হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) তাকওয়ার উপর আলোচনা করতে গিয়ে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি উদ্ধৃত করেছেন, "ওমান ইয়ূতি উ আল্লাহ ওয়া রাসূলুল্লাহ্ এয়াখ্শা আল্লাহ ওয়া ইয়াত্তাকও ফা উলায়েকা হুমুল ফায়েজুন"- যারা আল্রাহকে ও তাঁর রাসূলকে মানে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও সৎ জীবনযাপন করে, তারা পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে।" গাজ্জালী ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ প্রথমত আল্লাহ'র বাধ্যতা ও ভয়কে এবং পরে রাসূলের সুন্নাহকে উল্লেখ করেছেন এবং এরপর আল্লাহ'র দাসত্বে একাগ্রতাকে। এ সবই তাঁর মতে একটি বাক্যে ব্যক্ত করা যায়: তা হলো:- অন্তরকে পাপমুক্ত করা।" তাকওয়া

ইমাম গাজ্জালী আরো বলেন, তাঁর মতে তাকওয়া হলো সম্পুর্ণ বৈধ বা হালাল কিন্তু অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে ত্যাগ করা বা এড়িয়ে যাওয়া। তিনি রাসূলের এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।" যারা কোন সন্দেহমুক্ত জিনিসকে ত্যাগ করেছে এবং তা সম্পূর্ণ হালাল, তারা মুত্তাকী হিসাবে পরিচিত।

আবু সাইদ আল-খুদরী হতে বর্ণিত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। একদিন এক লোক রাসূলে করিমের (স.) কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহ'র রাসূল আমাকে আদেশ দিন" রাসূল (স.) বললেন আল্লাহ সম্পর্কে সতর্ক থাকো (সূরা ইমরান/১০২) কারণ এর মধ্যে সমস্ত কল্যাণ নিহিত।" আল্লাহ'র খাতিরে নিজের উপর যুদ্ধের ভার নাও, কারণ এটাই হলো মুসলমানের সন্ন্যাসধর্ম। নিজের উপর আল্লাহ'র স্মরণকে তুলে নাও, কারণ এ হলো তোমার জন্য আলো।

এক সূফী বলেছেন, "যখন আল্লাহ'র ভয়কে কেউ বাস্তবতায় পরিণত করে তখন আল্লাহ তার অন্তরকে এই পৃথিবীকে এড়িয়ে যেতে সহজ করে দেয়। আবুল হাসান আল ফারামী বলেছেন," আল্লাহ ভীতির একটি বাহ্যিক এবং একটি অভ্যন্তরীণ দিক আছে। এর বাহ্যিক দিক হলো, মানুষের ব্যবহারে আল্লাহ যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকে রক্ষা করা।এর অভ্যন্তরীণ বা অন্তস্থ দিক হলো, নিয়ত এবং আন্তরিকতা (নিয়ত ও ইখলাস)"

হযরত জুন নুন মেছরী বলছেন,

"যাদের অন্তর আল্লাহ'র সতর্কতাকে (আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করে)
তাদের ছাড়া অন্য কারো সাথে থাকা যায় না।
এবং যারা আল্লাহ'র জিকিরে আনন্দিত,

সন্তুষ্টি যারা একিন (নিশ্চয়তা) এবং তার কল্যাণে,
যেরকম মায়ের বুকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত।"

আবুল কাশেম আল কুশাইরী বলেছেন, একজন মানুষের আল্লাহ'র ভয় বা সতর্কতাকে তিনটি জিনিসের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়। আল্লাহ'র উপর তার বিশ্বাসের সৌন্দর্যে, তাকে আল্লাহ যা দেয়নি তার জন্য, তাকে যা দেয়া হয়েছে তার সন্তুষ্টির সৌন্দর্যের জন্য এবং তার যা হাতছাড়া হয়ে গেছে তার উপর ধৈর্যের সৌন্দর্যের জন্য।

আল-কুশায়েরী 'তাকওয়ার' বাস্তব প্রতিফলন সূফীদের জীবনে কিভাবে ঘটেছে তার কয়েকটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিরিন (হাদীস বর্ণনাকারী এবং বিখ্যাত স্বপ্নের ভাষ্যকার) হযরত উসমানের খিলাফত শেষ হবার দু'বছর আগে জন্মগ্রহন করেন। আল্লাহ'র হককে নিজের হকের উপর উর্ধেব কিভাবে রেখেছিলেন, তার একটি ঘটনায় তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি একবার মাখনের চল্লিশটি মাটির ঘড়া কিনেছিলেন। তাঁর চাকর একটি মাখনের পাত্র হতে একটি ইঁদুর বের করলো। ইবনে শিরিন চাকরটিকে জিজ্ঞাসা করলেন" কোন পাত্রটি হতে তুমি ইঁদুরটি বের করলে? লোকটি উত্তর দিল "আমি ত বলতে পারব না।" এরপর তিনি মাখনের সমস্ত পাত্র মাটিতে ঢেলে ফেললেন।"

অথবা আবু ইয়াজীদ আল বিস্তামীর কথা ধরা যাক। তিনি হামদানে কিছু জই কিনেছিলেন এবং এর কিছু তাঁর কাছে অবশিষ্ট ছিল। বিস্তামে ফিরে এসে দেখলেন, এর মধ্যে দুটি পিঁপড়া। তিনি হামদানে ফিরে গেলেন এবং পিপড়ে দুটিকে ছেড়ে দিলেন।

কথিত আছে ইমাম আবু হানিফা (র.) ঐ গাছের ছায়ায় কখনো বসতেন না, যে গাছটি এমন লোকের যিনি ইমামের কাছ থেকে টাকা ঋণ করেছেন। তিনি বলতেন, "এর উৎস হলো এই হাদীস" প্রত্যেক ঋণ যার উপর সুদ আছে তা হলো উচ্চসুদ।"

সূফী তাপস যাঁরা তাদের জীবন তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যাদের অন্তর মহান নৈতিকতার চাদরে আবৃত ছিল সেরকম কয়েকজন সূফী দরবেশের জীবনী থেকে কয়েকটি ঘটনা তাকওয়ার বিষয়টিকে আরো পরিস্ফুট করবে। অবশ্য দরবেশদের জীবনে যা সম্ভব, একজন সাধারণ বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে সেই স্তরের তাকওয়া অর্জন হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু এই দৃষ্টান্তগুলো হতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সব জিনিসকে আমরা স্বাভাবিক মনে করি তা যে তাকওয়ার কত পরিপন্থী তার একটি শিক্ষা নেয়া যেতে পারে।

কথিত আছে, হযরত আবু বায়েজীদ আল-বিস্তামী একবার এক মরুভূমির মরূদ্যানে কাপড় ধুলেন। তাঁর সাথে একজন সঙ্গী ছিল। সঙ্গীটি বলল চলুন ঐ আঙ্গুর বাগানের দেয়ালের গায়ে কাপড়টি শুকাতে দেই, তিনি (বায়েজীদ) কললেন, "না কারো দেয়ালের গায়ে পিন (পেরেগ) ঢুকাবে না।" সঙ্গীটি বলল, তাহলে আমরা কাপড়টি গাছের উপর ঝুলায়ে দিই," তিনি বললেন, "না এতে গাছের ডাল ভেঙ্গে যেতে পারে।" আমরা তা হলে "ঘাসের উপর বিছিয়ে দেই," "না, জীবজন্তু ঘাস খায়, আমরা তাদেরকে বাধাগ্রস্থ করব না।" এরপর তিনি (বায়েজীদ)' সূয্যের দিকে পিঠ দিয়ে কাপড়টি পিঠে নিয়ে একদিকে শুকালেন, এরপর কাপড়টির অন্য পিঠ শুকালেন।

আবু ইয়াজীদ বায়েজীদ বিস্তামী একদিন জামাতে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে গেলেন। এবং তাঁর হাতের লাঠি মাটিতে রাখলেন। তা রাখতে গিয়ে লাঠিটা স্লিপ করে পাশে রাখা আরেকটি লাঠির উপর গিয়ে পড়ল যেটা পড়ে গেল। এই লাঠিটা ছিল পাশে বসা একজন বৃদ্ধ লোকের। তিনি উপুর হয়ে বেঁকে তাঁর লাঠিটা তুললেন। আবু ইয়াজীদ নামাজ থেকে বৃদ্ধ লোকটির বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং বৃদ্ধের কাছে মাফ চাইলেন, বায়েজীদ বললেন," আপনাকে যে উপুড় হয়ে লাঠিটা তুলতে হল তার কারণ আমার অমনোযোগিতার জন্য লাঠিটা পড়ে গিয়েছিল"

ইব্রাহীম ইবন আদহাম বর্ণনা করেছেন, "আমি এক রাত্রে জেরূজালেমের মসজিদুল আকসায় ছিলাম। কিছু রাত্রি অতিবাহিত হবার পর দুঁজন ফেরেশতা আসলেন। একজন আর একজনকে বললেন, "এখানে কে?" "ইব্রাহীম ইবন আদহাম " অপরজন বললেন, "তিনি ঐ লোক যাকে আল্লাহ সোবহানাহু ওতায়ালা এক ডিগ্রী (একধাপ) নিচে নামিয়ে দিয়েছেন," "কেন?" কারণ তিনি বসরায় কিছু খেজুর কিনেছিলেন। এবং দোকানদারের একটি খেজুর, তার খেজুরের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তিনি তা দোকানদারকে ফেরৎ দেন নাই।" ইব্রাহীম ইবন আদহাম বললেন, তিনি বসরায় ফিরে গেলেন। উক্ত দোকানী থেকে খেজুর কিনলেন এবং তাঁর ক্রীত খেজুর হতে একটি খেজুর দোকানদারের খেজুরের মধ্যে ফেলে দিলেন এবং জেরুজালেম ফিরে এলেন এবং মসজিদুল আকসায় রাত্রি অতিবাহিত করলেন হঠাৎ তিনি দেখলেন উক্ত দুজন ফেরেশতা বেহেস্ত 'হতে' নেমে এসেছেন। এদের একজন (দেখলেন) অপরজনকে বলতে শুনলেন, "ওখানে কে?" ইব্রাহীম ইবন আদহাম" এবং বললেন, "সে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তার নিজের জায়গায় ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং যার মর্যাদা (স্তর) উপরে তুলেছেন।"

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন "মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অভিজাত হলো এই পৃথিবীতে ঐ জন যাঁরা দানশীল এবং পরকালে সবচেয়ে অভিজাত হলো ঐ জন যারা তাকওয়া (আল্লাহ'র ভয়) অবলম্বন করে।"

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে 'তাকওয়ার' ভূমিকা কত ছোট এবং সহজ কাজ হতে শুরু হতে পারে তার একটি উদাহরণ রাসূলে করিমের একটি উপদেশ হতে উদ্ধৃত করা যায়। রাসূলের একটি খুবই পরিচিত হাদীসে রাসূল তাঁর উম্মতদের খাবার খেতে গিয়ে তাদের পাকস্থলির এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখার কথা বলেছেন অর্থাৎ উদরপূর্ন করে খাবার থেকে যেন মানুষ নিবৃত থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় এটি যেমন স্বাস্থ্যকর তেমনি এটি তাকওয়ারও অংশ। মানুষ আল্লাহ'র এবাদত বন্দেগীতে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হলে, অতি ভর্তি উদর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে এই সংযত খাবার জিহ্বা ও জঠরের লেলিহান লোভ হতে নিজেকে রক্ষা করে।

হযরত মওলানা জালালউদ্দীন রুমী (র.) তাঁর মুরীদদের সত্য ও সৎপথে আহবান জানিয়েছিলেন এই কবিতাটির মাধ্যমে।

"আমি তোমাদের জন্য উইল (ইচ্ছাপত্র) করছি,
গোপনে এবং প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করার জন্য,
কম খাবার জন্য,
কম ঘুমাবার জন্য,
পাপ হতে বিরত থাকার জন্য,
লালসা থেকে বিমুখ থাকার জন্য,
মানুষের উৎপীড়ন এবং খারাপ ব্যবহার সহ্য করার জন্য,

লম্পট ও ইতরজনের সংসর্গ এড়াবার জন্য,
জ্ঞানী ও দয়ালু লোকের সংস্পর্শে থাকার জন্য;
কারণ উপকারী লোক ঐ জন, যিনি অপরকে অনুগ্রহ করে
এবং সবচেয়ে উপকারী শব্দ ঐটি যা সংক্ষিপ্ত ও আন্তরিক।"
(আখলাকী কর্তৃক উদ্ধৃত আরেফলেরিন মেনকিবেলেরি হতে)

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটির নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং সূফী গবেষক
জার্মান বহুজাতিক কোম্পানী, হোয়েফষ্ট বাংলাদেশের ভূতপূর্ব ম্যানেজিং ডিরেক্টর

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ধারা (প্রথম পর্ব)

বাংলাদেশের প্রাচীন অধিবাসীগণ প্রধানত দ্রাবিড় জাতির একটি শাখা ছিলেন। সিন্ধু নদের অববাহিকায় মোহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দ্রাবিড় সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাবিলনীয় ও এ্যাসিরিয় নগর-সভ্যতার পতাকাবাহী দ্রাবিড়গণ বাংলাদেশেও একটি উন্নত সভ্যতার পত্তন করেছিলেন।

ঐতিহ্যগতভাবে দ্রাবিড়গণ তৌহিদবাদী আদর্শের উত্তর-পুরুষ। সত্য ও সুন্দরের প্রতি এবং স্বচ্ছ জীবনবোধের প্রতি তাদের আকর্ষণ চিরন্তন। ভারতের বুকে প্রধান যে তিনটি ধর্মের ক্রমবিকাশ ঘটেছে, বাংলাদেশের জনগণ সে তিনটি রূপকে ক্রমাগতভাবে সস্নেহে নিজের করে নিয়েছেন। বিশ্বাস, সৎকর্মশীলতা ও অহিংসার বাণীবাহী জৈন ধর্ম এ এলাকায় প্রচারিত হবার সাথে সাথে এদেশের মানুষের চিত্তজুড়ে ঠাঁই করে নিয়েছে। অহিংসা জীবের দয়া, পবিত্র জীবন-যাপন ও পরমাত্মার বুকে জীবাত্মার নির্বাণ লাভের বুদ্ধবাণী তাদেরকে এক উন্নত জীবনবোধে সঞ্জীবিত করেছে। সবশেষে ইসলাম এদেশের মানুষের হৃদয়জুড়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছে এবং ইসলাম তাদের চূড়ান্ত মঞ্জিলরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

এ জনপদের বাসিন্দাগণ আর্যদের শের্কবাদী ধর্ম, তাদের ধর্মগ্রন্থ, তাদের তপস্যা ও যাগযজ্ঞকে কোনদিন স্বীকার করেননি। আর্যদের সামাজিক ঘৃণাবাদ এবং তাদের ব্রাহ্মণদের নরশ্রেষ্ঠ হবার ধারণাকেও তারা কোনদিন মেনে নেননি। আর্য আক্রমণের ফলে সিন্ধু অববাহিকায় মোহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা ধ্বংস হয় এবং ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ এলাকার বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়। এ সময় বাংলাদেশ বৌদ্ধদের শেষ আশ্রয়স্থলরূপে চিহ্নিত হয়। বঙ্গ-দ্রাবিড়গণ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মকে অবলম্বন করে হাজার বছর ধরে আর্যদের সামরিক অভিযান প্রবলভাবে প্রতিহত করেন। দ্রাবিড় সভ্যতার এই লীলাভূমিতে রাজনৈতিকভাবে কদম জমাতে আর্যদের বুকের অনেকগুলো পাঁজর ভেঙ্গে যায়। ঈসায়ী পাঁচ ও ছয় শতকের আগে এখানে আর্যরা আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি। রাজশক্তির দাপট এবং নজিরবিহীন সামাজিক নিপীড়ন চালিয়ে আর্যরা এদেশের মানুষকে ব্রাহ্মণবাদী সংস্কৃতির বশীভূত করার চেষ্টা চালায়। ইতিমধ্যে ইসলাম এসে এদেশের মানুষের হাজার বছরের প্রতিরোধ সংগ্রামকে বহু গুণে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করে তোলে। জনগণের সংগ্রামের ধারাবাহিকতার পথ ধরেই ইসলাম বাংলাদেশে 'সাদর আহবানে অভিনন্দিত হয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।' (ডক্টর আরনল্ডঃ প্রিচিং অব ইসলাম)।

ইসলামের উৎস-ভূমির সাথে বাংলার সুপ্রাচীন সম্পর্ক

বাংলাদেশের সাথে আরবদের সম্পর্কের ভিত্তি অত্যন্ত প্রাচীন। এলফিনস্টেন উল্লেখ করেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সমসাময়িককালে দুই এলাকার মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল (হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া)। এই বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দুই এলাকার জনগণের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছে। বাণিজ্যিক যোগাযোগের ভিত্তিতে প্রাচীনকালেই উপমহাদেশের বিভিন্ন উপকূলে বহু আরব উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। একইভাবে আরবের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় বসতি। দক্ষিন ভারতের মালাবার, কালিকট, চেরর এবং বাংলার চট্টগ্রাম ও আরাকান উপকূলে আরব জনগণের এরূপ বসতি ইসলাম-পূর্ব কয়েক শতক আগে থেকেই গড়ে উঠেছিল। (এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্যের জন্যে আল্লামা সৈয়দ সোলায়মান নদভীর 'আরব ও হিন্দকে তায়ালুকে' এবং ডক্টর মোহাম্মদ যাকী সম্পাদিত 'অ্যারার একাউন্টস অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থ দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।) জেমস টেইলর উল্লেখ করেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের কয়েক হাজার বছর আগে দক্ষিণ আরবের সারা কওমের লোকেরা এই উপমহাদেশের পুর্ব-উত্তর এলাকায় পালতোলা জাহাজে করে আসতেন। এর নিদর্শন তাদের প্রতিষ্ঠিত সাভার বন্দরে রয়েছে। (Remarks on the sequel to periplus of the Erithrian Sea, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol-16, 1847 P-76; Asiatic Researches on the Arabs, Vol-11 By Sir William Jhones, P-3)। 'সাবাদের 'উর' বা নগর থেকে 'সাবাউর' এবং তারই অপভ্রংশ হিসাবে পরবর্তীকালে এই বন্দর সাভার নামে পরিচিতি হয়েছে। (মুফাখখারুল ইসলাম ঃ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্ব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্ব সংখ্যা, ১৯৮৪।)

বাংলাদেশের এমনি আরো বহু জনপদ আজো আরব বণিকদের দেয়া নাম ধারণ করেছে। আরবগণই চট্টগ্রামের নাম করণ করেন শাত-ইল-গঙ্গা বা গঙ্গার মোহনা। নয় শতকের আরব বণিক সুলাইমান এবং দশ শতকের ভৌগোলিক ইদরিসী বাংলার অন্যতম প্রাচীন জনপদ, কার্পাসখ্যাত কাপাসিয়ার টোক বন্দরকে 'তওক' বলে উল্লেখ করেছেন। বানার নদী এখানে 'তওক' বা গলার হারের মতো বেঁকে ব্রহ্মপুত্রের কণ্ঠলগ্ন হয়েছিল বলে আরবগণ তাদের প্রতিষ্ঠিত এই পোতাশ্রয়টিকে 'তওক' নামে অভিহিত করেছেন। (টোকের অপর পাড়ে ঈসা খাঁর এগারো সিন্ধুর অবস্থিত।)

আরবগণ জাহাজে করে সাগর-মহাসাগরে ভাসতে ভাসতে এসে দূর থেকে উত্তরবঙ্গের লাল মাটি ভূখন্ড দেখে চিৎকার করে উঠতেন 'বাররি হিন্দ' বলে। 'বার' মানে মাটি। সেই থেকে উত্তরবঙ্গ বররিন্দ বা বরিন্দ নামে পরিচিত হয়েছে। (পূর্বোক্ত)। মিনহায উদ্দীন সিরাজ এ এলাকাটিকে বররিন্দ নামেই উল্লেখ করেছেন। বাংলার অন্যতম প্রাচীন বন্দর নদী-বন্দর ভৈরবের নাম আরবদের দেয়া 'বহর-ই-আব' বা পানির দরিয়া থেকে হয়েছে বলে মনে করা হয়। মুসলমাননের বিবরণীতে 'সালাহাত'ও 'কামরুত' নাম দু'টি পাওয়া যায়। 'সালাহাত' সিলেটের আরব প্রদত্ত নাম, যার অর্থ সদানুষ্ঠান। কামরুপের নাম মিনহায উদ্দীন সিরাজ ও কামরুত লিখেছেন। 'বাঙ্গালী যুগে যুগে' নামক বইতে নাজির আহমেদ উল্লেখ করেন যে, কামরুত নামটি 'কওম-ই-হারুত' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর মতে, যে সব নামের শুরুতে 'কম' বা 'কুম' আছে, সেগুলো আর্যভাষা থেকে উদ্ভূত নয়।

মক্কা-মদীনার সাথে বাংলার প্রাচীন যোগাযোগ

মক্কার কুরাইশ বণিকগণ নৌপথে বহির্বাণিজ্যের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন রাসূল (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচারের অনেক আগে, ঈসায়ী পাঁচ শতকের শেষ ভাগে। বছরে অন্তত দুইবার তাদের নৌবহর উপমহাদেশের বিভিন্ন বন্দরে নোঙর করতো। বাণিজ্য-পণ্যের লেনদেনর সাথে সাথে তাদের মাধ্যমে দুই এলাকার মধ্যে তথ্যের নিয়মিত আদান-প্রদান চলতো। (সৈয়দ সোলাইমান নদভী ঃ আরব ও হিন্দকে তায়ালুকাত)

ঐতিহাসিক খালিক আহমদ নিজামী উল্লেখ করেন যে, যোগাযোগ ও লেনদেনের এই বিস্তীর্ণ পটভূমিতেই রাসূল (রাঃ) ভারতীয় এলাকা থেকে সুগন্ধি দ্রব্য উপহার পেয়েছেন এবং একজন ভারতীয় রাজা তাঁকে আচার পাঠিয়েছেন ভারতীয় চিকিৎসকগণ আরবে মশহুর ছিলেন। রাসূল (সাঃ)-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চিকিৎসার জন্য তখন আরবে অবস্থানকারী একজন ভারতীয় চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করা হয়। হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর পুত্র হযরত ইমাম যায়নুল আবেদীন ভারতীয় মায়ের সন্তান ছিলেন।

মালাবারের অন্তর্গত চেররের রাজা চেরুমাল পেরুমাল রাসূল (সাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচারের কথা জানতে পেরে সরন্দ্বীপবাসীগণ রাসূল (সাঃ)-এর কাছে দূত পাঠিয়েছেন। সরন্দ্বীপের রাজা এ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। (ডক্টর মোহাম্মদ যাকী সম্পাদিত এ্যারাব একাউন্টস অব ইন্ডিয়া গ্রন্থের ভূমিকা।) আরব ও ভারতীয়দের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং নিয়মিত যোগাযোগের কারণে মক্কায় ইসলামের নবীর আবির্ভাবের খবর স্বভাবতই সাথে সাথে এখানে পৌঁছেছিল।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়

ইসলামের বাণী বহির্বিশ্বে প্রচারের উদ্দেশ্যে রাসূল (সাঃ) কিছু সংখ্যক সাহাবিকে হাবশা বা আবিসিনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। লোহিত সাগরের প্রবেশ পথে অবস্থিত হাবশা ছিল সে সময়ের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। পশ্চিমে মিসর এবং পূবে চীন পর্যন্ত দীর্ঘ সমুদ্রপথে চলাচলকারী নৌ-বহর হাবশায় এসে যাত্রাবিরতি করতো। রাসূল (সাঃ) এই স্থানটিকে খবর আদান-প্রদানের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখান থেকেই নবুয়তের সপ্তম বছরে সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারকদের একটি দল সম্রাট নাজ্জাসীর দেয়া দু'টি সমুদ্রগামী পালতোলা জাহাজে করে পুর্বদিককার দীর্ঘ বাণিজ্য-পথ ধরে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এই দলে অন্য তিনজন সাহাবী ছিলেন হযরত কায়েস ইবনে হুযাফা (রাঃ), হযরত ওরওয়াহ ইবনে আছাছা (রাঃ) এবং হযরত আবু কায়েস ইবনুল হারেস (রাঃ)। এছাড়া ছিলেন কয়েকজন হাবশী মুসলমান। দলনেতা সাহাবী হযরত আবু ওয়াক্কাস রাসূল (রাঃ)-এর মাতা হযরত আমিনার চাচাতো ভাই এবং সেই হিসাবে রাসূল (সাঃ)-এর মামা ছিলেন। কাদেসিয়া বিজয়ী সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস তার পুত্র।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর বিশি্ষ্ট হাদিসবেত্তা ইমাম আবাদান মারওয়াযীর বিররণ এবং চীন থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যসূত্র হতে জানা যায় যে, এই ইসলাম প্রচারক দলের জাহাজ দু'টি নবুয়তের সপ্তম বছরে হাবশা থেকে রওনা হয়ে ৬২৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী তিন সনে চীনের ক্যান্টন বন্দরে নোঙর করে। পথে তাঁরা কমপক্ষে নয় বছর ভারত ও বাংলাদেশর বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় অতিবাহিত করেন। শায়খ যয়নুল আবেদীন তাঁর তোহফাতুল মুজাহিদীন গ্রন্থে লিখেছেন, আরব দেশের একদল লোক জাহাজে করে ভারতের মালাবারে আসার পর চের দেশের রাজা চেরুমাল পেরুমাল তাদের প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাজা পরে মক্কা শরীফে গিয়ে রাসূল (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন।

আল্লামা সৈয়দ সুলাইমান নদভী তাঁর আরবোঁকা জাহাজরানী বা 'আরব নৌবহর' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আরবের নাবিকগণ মালাবার উপকূল হয়ে চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন। এখানকার চট্টগ্রাম এবং সিলেটে তাদের বাণিজ্য বহর নোঙর করতো। দীর্ঘ পথে পালতোলা জাহাজের পক্ষে একটানা যাত্রা সম্ভব ছিলো না। পথে পথে বিভিন্ন মনযিলের জন্য রসদপাতি সংগ্রহ করতে হতো। চীনা পরিব্রাজক মাহুয়ান তাঁর বিররণীতে উল্লেখ করেন যে, বর্তমান চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বন্দর নগরীতে খুব উন্নতমানের সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হতো। এসব জাহাজ সমগ্র প্রাচ্য জগতে ব্যবহার হতো। দূরপথে যাতায়াতকারী প্রতিটি জাহাজ এই বন্দরে যাত্রাবিরতি করে তাদের জাহাজ এখান থেকে মেরামত করতো। হযরত আবু ওয়াক্কাসের কাফেলা বাংলার এই বিখ্যাত বন্দরে যাত্রাবিরতি না করে সুদূর চীনের পথে পাড়ি জমাতে দেয়া অসম্ভব ছিল। এসব কারণে অনেক মনীষী দৃঢ়ভাবে মনে করেন যে, হযরত আবু ওয়াক্কাস এবং তাঁর সাথীগণ অবশ্যই বাংলার বন্দরে যাত্রাবিরতি করেছিলেন এবং এখানে একটি যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত অবস্থান করে কিছু লোককে ইসলামে দীক্ষিত করে গিয়েছিলেন।

এভাবে রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় এমনকি মক্কায় ইসলাম প্রচারের প্রায় সমসাময়িককালেই বাংলায় ইসলামের আলো এসে পৌঁছেছিল এবং রাসূল (সাঃ)-এর সাহাবীগণের হাতেই বাংলাদেশে ইসলামী আদর্শের প্রচারধারার সূচনা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মওলানা মহীউদ্দীন খান লিখেছেন ঃ ''১. খোদ রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় এমনকি সম্ভবত হিজরতের আগে বাংলার উপকূল অঞ্চলে ইসলামের আলো বিস্তার লাভ করেছে, ২. বাংলাদেশে সাহাবীর আগমন হয়েছে এবং তারা এদেশে যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী বা তায়েবী রেখে গেছেন, ৩. অসম্ভব নয় যে, দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার দূরবর্তী এলাকা এমনকি চীনে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুসলমানগণও অংশগ্রহণ করেছেন, কেননা হযরত আবু ওয়াক্কাসের (রাঃ) সুদীর্ঘ সফরে প্রতিটি যাত্রাবিরতি স্থান থেকেই পরবর্তী মনযিল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য লোক-লস্কর ও রসদাদি সংগ্রহ করার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হয়েছিল।" (বাংলাদেশ ইসলাম ঃ কয়েকটি তথ্যসূত্র; ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, এপ্রিল-জুন সংখ্যা, ১৯৮৮।

হযরত উমরের খিলাফতকালে

হযরত উমরের খিলাফতকালে একদল ইসলাম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন। এই দলের নেতা ছিলেন হযরত মামুন ও হযরত মুহাইমিন। এই প্রচারকগণ মু'মিন নামে পরিচিত হন। ১২ থেকে ২৪ হিজরীর মধ্যে তাদের আগমন ঘটে। এরপর হযরত হামেদ উদ্দীন, হযরত মুর্তাজা, হযরত আব্দুল্লাহ ও হযরত আবু তালিবের নেতৃত্বে আরেক দল ইসলাম প্রচারক বাংলাদেশে আসেন। সমসাময়িকালে এরূপ পাঁচ দল ইসলাম প্রচারক এদেশে আসেন বলে জানা যায়। ডক্টর হাসান জামান উল্লেখ করেন যে, এই সকল প্রচারকের সাথে কোন অস্ত্র বা বই-কিতাব থাকতো না। এ এলাকার মানুষের মুখের ভাষা শিখে সে ভাষার মাধ্যমেই তাঁরা ইসলামের দাওয়াত প্রচার করতেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল স্বল্প সংখ্যক সত্যিকার মুসলমান তৈরী করা, যারা এদেশে মুসলিম সমাজের ভিত্তিরূপে কাজ করবেন। এই প্রচারকগণ প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বাস করতেন এবং এক স্থান থেকে অন্যত্র সফর করে জনগণকে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন। (সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য)।

বাংলাদেশে উনসত্তর হিজরীর মসজিদ

রংপুর শহর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে লালমনিরহাটের পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার মজদের আড়া গ্রামে ৬৯ হিজরীর একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার হবার খবর ১৯৮৬ সালের ২৩ এপ্রিলের দৈনিক বাংলায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক ইনকিলাব এ সম্পর্কে বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। মজদের আড়া নামে পরিচিত ৩০ শতাংশ জমিতে একটি বাঁশঝাড়ের উঁচু মাটির টিলা সমতল করতে গিয়ে এ মসজিদটি আবিষ্কৃত হয়। এর গম্বুজ থেকে প্রাপ্ত ৬''x ৬''x ১-১/৪'' আকৃতির বিশেষ ধরনের ইটগুলোতে নানা ধরনের ফুল, নকশা ও আরবী হরফে লেখা কালেমা তাইয়্যেবাসহ হিজরী ৬৯ সন লেখা আছে। এছাড়া ১৭ হাত দীর্ঘ ও ১৫ হাত প্রস্থের একটি দালানের ছাদের ছক মাটির নিচে দেখা যায়, এটি মসজিদের ছাদ বলে মনে হয়। এই স্থানটি থেকে দুঁশ গজ দূরে প্রায় দশ গজ উঁচু প্রাচীরবেষ্টিত প্রায় এক হাজার গজ দীর্ঘ ও এক হাজার গজ প্রস্থ একটি গড় ছিল বলে জানা যায়। এই গড়টিকে এখন আবাদী জমিতে পরিণত করা হয়েছে গ্রামের নাম 'মজদের আড়া' আসলে 'মসজিদের আড়া'র অপভ্রংশ বলে অনুমান করা যায়। আড়া মানে ঘাঁটি, ডাঙ্গা বা কিনারা। এই মসজিদকে ঘাঁটি করে ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে এখানে একটি মুসলিম জনপদ গড়ে উঠেছিল এবং এ অঞ্চলটি মসজিদের আড়া নামে পরিচিত হয়েছিল। এই স্থান থেকে সিকি মাইল দূরে ফকিরের তকেয়া এবং মুস্তবীর হাট এবং মজদের আড়া গ্রামের চারদিকে তিন-চার মাইলের মধ্যে অনেক প্রাচীন মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি ৬৯ হিজরীর বলে প্রত্নতাত্ত্বিক

গবেষকদের স্বীকৃতি লাভ করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে যে, কারবালায় হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের মাত্র আট বছরের ব্যবধানে এবং মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের চব্বিম বছর আগে উমাইয়া শাসনকর্তা প্রথম মারওয়ানের পুত্র আবদুল মালেকের শাসনামলেই বাংলার এই নিভৃত এলাকায় মুসলিম সমাজ গড়ে উঠেছিল। এমনি ধরনের মুসলিম জনপদ এবং তাদের দ্বীনি কার্যক্রমের কেন্দ্ররূপে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সে আমলে মসজিদ প্রতিষ্ঠার খবর বিস্ময়কর হলেও তার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। বালাযুরী তাঁর 'ফুতুহুল বুলদান' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, উমাইয়া খলিফা হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (৭১৭-৭২০ ঈসায়ী) ভারতের বিভিন্ন রাজাকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দিয়ে বহুসংখ্যক চিঠি লিখেছেন। পত্র যোগাযোগের ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের রাজা জয় সিংহ ইসলাম কবুল করেন। তখনকার বাংলা বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক লিখেছেন, সে সময় চট্টগ্রাম এলাকায় মুসলমান আমীর বা সুলতানের অধীনে একটি ক্ষুদ্র শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল। (মুসলিম বাংলা সাহিত্য পৃ-৪)।

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগে সাত শতকের মধ্যভাগ থেকে আট শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার অবস্থা ছিল চরম অরাজকতাপূর্ণ। ইতিহাসে এই যুগে চিহ্নিত হয়েছে মাৎস্যান্যায় নামে। এই সময়ে এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক আদর্শের ওপর আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদ আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছিল। ইসলাম প্রচারকগণকে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করেই এখানে অগ্রসর হতে হয়।

আব্বাসীয় শাসনামল

আট শতকের মধ্যভাগে বাংলায় পাল শাসন এবং মুসলিম জাহানে আব্বাসীয় শাসনের সূচনা হয়। আব্বাসীয় যুগে ভারতবর্ষের সাথে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় পন্ডিত এবং আরব মুসলমানদের মধ্যে এ সময় ইসলাম সম্পর্কে সংলাপ বা মতবিনিময় জোরদার হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজদরবারে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার জন্যে মুসলিম বিশেষজ্ঞগণকে দাওয়াত করে আনা হতো।এ ছাড়া অনেক ভারতীয় রাজার দরবারে মুসলমানগণ 'হুনুরমান্দ' বা বিচারকের মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেন। নয় শতকের আরব বণিক সুলায়মান উল্লেখ করেন যে, এসব ভারতীয় শাসক মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের শাসনামলে মুসলমানগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করেছেন এবং মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায় করতেন। বিভিন্ন আরব শাসক তাদেরকে 'আরবপন্থী মহান ভারতীয় শাসক' বলে উল্লেখ করেছেন।

পাল আমলে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পালদের শাসন বাংলার বাইরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় উল্লেখ করেন যে, এই আমলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র উত্তর ভারত থেকে ক্রমশ দক্ষিণ ভারতে সরে আসতে থাকে। আট শতকের গোড়া থেকে সমৃদ্ধ ব্যবসা-বণিজ্যে আরব ও পারস্য বণিকদের একটা মোটা অংশীদারিত্ব ছিল। (বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব)। রাজশাহীর পাহাড়পুরে আব্বাসীয় বাদশা হারুনুর রশীদের আমলের (৭৮৬-৮০৯) একটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই মুদ্রা পাল শাসনাধীন বাংলাদেশে আরব বণিকদের নিবিড় বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রমাণ বহন করে। সেই আমলে মুসলমান বণিকগণ শুধু পণ্যের লেনদেন করতেন না। ইসলামী আদর্শের দাওয়াত প্রচার করাকেও তাঁরা অপরিহার্য দায়িত্ব বিবেচনা করতেন। আট, নয় ও দশ শতকে নৌপথে চট্টগ্রাম উপকূল থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত এবং স্থলপথে রাজশাহীর পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতিতে ইসলাম পরিচিতি লাভ করেছিল। দেশের প্রধান নদ-নদীর পুরনো প্রবাহ সে যুগের বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্যে নৌ যোগাযোগের চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

পাল শাসনের (৭৫০-১১৬২ ঈসায়ী) বিস্তীর্ণ অধ্যায়ের মাত্র অল্প ক'জন ইসলাম প্রচারকের ত্যাগ ও সংগ্রামের কাহিনী এ যাবত ঐতিহাসিকগণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য আলিম, সূফী-দরবেশ ও মুজাহিদ বাংলাদেশের ইসলাম প্রচার করেন । তাদের মধ্যে বায়েজিদ বুস্তামী (চট্টগ্রাম, মৃত্যু ৮৭৪ খৃঃ), সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ার (ঢাকা ও বগুড়া, ১৪০৭), শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী (নেত্রকোনা, ১০৫৩) বিখ্যাত নাম। মওলানা ফরিদ উদ্দীন আত্তার কোন তথ্যসূত্র উল্লেখ ছাড়াই একটি প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ'' অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে একদল ইসলাম প্রচারক সমুদ্রপথে আরবের দেশ থেকে এসে এখানে সাগর তীরে নামেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে নিমগ্ন হন। চট্টগ্রাম রেলস্টেশনের পাশে পাহাড়ের আশেপাশে এরূপ কতিপয় নাম না জানা সেকালের আউলিয়ার মাজার আছে। ..... যদিও কবরের চিহ্ন আজ বিদ্যমান নেই, তবুও ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, শেখ আব্বাস বিন হামজাহ নিশাপুরী এই ঢাকাতেই ইসলাম প্রচার করতে করতে ২৮৮ হিজরী / ৯০০ ঈসায়ী সনে ইন্তেকাল করেন। সোজা কথায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার তিনশত বছর পূর্বেই ঢাকায় ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। এই দশম শতাব্দীতে ঢাকায় আরো যারা ইসলাম প্রচার করেন, তাদের মধ্যে হযরত শেখ আহমদ বিন মুহাম্মদ (মৃত্যু ৩৪১ হিঃ/ ৯৫২ ঈঃ), হযরত শেখ ইসমাঈল বিন নযন্দ নিশাপুরী (মৃত্যু ৩৬৬ হিঃ/৭৯৫ ঈঃ) প্রমুখ রয়েছেন।" (বাংলাদেশে ইসলাম/প্রবন্ধ, দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ জুলাই ১৯৮৬)।

দশ ও এগারো শতকে গৌড় থেকে চট্টগ্রাম এবং সিলেট থেকে মঙ্গলকোট পর্যন্ত সারা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, নগরে-বন্দরে সর্বত্র ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল। পাল শাসকদের সাংস্কৃতিক অসচেতনতা ও বৌদ্ধ মতবাদের সামাজিক শক্তির অভাবের সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ মানুষে মানুষে হিংসা, ঘৃণা এবং কৃত্রিম বিভেদ ও বৈষম্যের যে পাহাড় সৃষ্টি করেছিল, আসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী ছিল তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ। ইসলাম প্রচারকদের কেন্দ্র করে দলিত জনতা ক্রমেই একটি সংগ্রামী কাফেলায় ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল।

সেন-বর্মণ যুগের স্বৈরাচার ও ইসলাম প্রচারকদের ভূমিকা

পাল শাসনের পর এদেশে বিদেশাগত সেন-বর্মণদের স্বৈরাচারী শাসন কায়েম হয়। এ যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তখন চলছে বেদ-পুরাণ আশ্রিত বর্ণাশ্রমবাদী শোষণ-জুলুম। সমাজের মাথার ওপর চেপে বসা দুর্নীতিপরায়ণ জনবিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণদের স্বৈরাচার। সমাজে অন্তর্বিরোধ, ঘৃণা ও অবিশ্বাস। সমাজের উঁচুতলায় ঐশ্বর্যবিলাসী ধনীদের কামনা-বাসনার উচ্ছ্বাস। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে চলছিল দেহগত ভোগবিলাস, দেবদাসী চর্চা, চারিত্রিক লাম্পট্য। সাহিত্যে, কাব্যে অশ্লীলতা ও যৌনতার ছড়াছড়ি। দেশের সাধারণ মানুষ নীচ কুলোদ্ভব ইতররূপে চিহ্নিত, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের হাহাকার চারিদিকের বাতাস ভারাক্রান্ত। এসবই ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন শাসনামলের বৈশিষ্ট্য। এই যুগে ইসলাম প্রচারকগণ এদেশের মজলুম জনগণের প্রকৃত বন্ধুরূপে তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন। ইসলাম প্রচারকদের নেতৃত্বে জনগণের মুক্তি সংগ্রামের একটি নতুন ধারা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠলো।

বারো শতকের শেষ নাগাদ বাংলার প্রায় প্রতিটি বিখ্যাত শহরে-বন্দরে এবং দেশের অভ্যন্তর ভাগের বিখ্যাত গ্রামে সত্য ও মিথ্যা, হক ও বাতিল এবং ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে সত্যের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। গাঙ্গেয় অববাহিকার অভ্যন্তরে একটি নীরব বিপ্লবের ধারা এগিয়ে চলছিল। বাংলার অধিবাসীরা হাজার বছর থেকে আর্যদের বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে আসছিলেন, রাসূল খোদার আদর্শে পতাকাবাহীগণ তাদের সেই প্রতিরোধ ক্ষমতাকে

বহু গুণে বাড়িয়ে তুললেন। বৌদ্ধ ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের লোকেরা মুসলমানদের মধ্যে তাদের আত্মরক্ষার উপায় খুঁজে পেলেন। ইসলাম প্রচারকদের সীমাহীন ত্যাগ, অদম্য সাহস, অবিচল মনোবল, সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের নিঃস্বার্থ সেবা, আন্তরিক ভালোবাসা, নিষ্কলুষ উন্নত চরিত্র এদেশবাসীর সুপ্ত প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলতে ও সংগঠিত করতে সহায়ক হয়েছিল।

জীবনবিমুখ বৌদ্ধ ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসনের মোকাবিলায় নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় ও পরাজয়ের মনোভাব আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সে পটভূমিতে জনগণের মুক্তির লড়াইয়ে ইসলাম প্রচারকগণই ছিলেন আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তথাকথিত অবর্ণ ও অচ্ছুৎ বলে অভিহিত সাধারণ হিন্দুদের প্রতিবাদও আন্দোলিত হচ্ছিল ইসলাম প্রচারকদের নেতৃত্ব। ইসলাম প্রচারকগণ জন্ম. বংশ, গোত্র, বর্ণ ও বিত্তের কৃত্রিম ব্যবধান ভেঙ্গে ফেলে সামাজিক সাম্য, ন্যায়বিচার ও সংহতির যে আহবান সেদিন প্রচার করেছিলেন এমন দ্রোহাত্মক ও বিপ্লবী কোন স্লোগান বাংলার দলিত জনতা অতীতে কখনো শোনেনি। ব্রাহ্মণ্যবাদ তার দীর্ঘকালীন আধিপত্যের মধ্য দিয়ে বাংলার সমাজদেহে যে ক্লেদ, গ্লানি ও দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জিভূত করেছিল, ইসলাম প্রচারকগণ পরম যত্নে তা মুছে ফেলতে সচেষ্ট ছিলেন। তাদের কল্যাণ-স্পর্শে বাংলার নিঃস্পন্দ জনপদ ধীরে ধীরে সুপ্তি ভেঙ্গে জেগে উঠেছিল।

নির্যাতিতের বন্ধুরূপে

ইসলাম প্রচারকগণ জনগণের সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যন্ত এলাকায় সংগঠন কায়েম করেন। তাঁদের গড়ে তোলা মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহগুলো জনগণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়। সেসব খানকাহ নির্যাতিতদের আশ্রয়স্থল, অভুক্তের জন্য লঙ্গরখানা এবং তাদের মুক্তি সংগ্রামের ঘাঁটিরূপে কাজ করছিল। এভাবেই ইসলাম প্রচারকদের নেতৃত্বে বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় এসব মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহকে কেন্দ্র করে মুক্তিপাগল জনতার সংগ্রাম সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এদেশের বিপন্ন নরনারীর কাছে ইসলাম প্রচারকগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রকৃত নায়করূপে। ব্রাহ্মণ্যবাদী জুলুম নিপীড়নের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দলে দলে মানুষ ইসলামকে আশ্রয় করে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। তাদের ফরিয়াদ শুনে ইসলাম প্রচারকগণ ছুটে গেছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। অনেক সময় তাঁরা অত্যাচারী শাসক ও সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছেন নির্যাতিত মানুষের রক্ষার উদ্দেশ্যে। নির্যাতিত জনতা তাদের পিছনে কাতারবন্দী হয়ে এ সকল লড়াইয়ে শরিক হয়েছেন।

মানিকগঞ্জের হরিরামপুরের রাজা বলরাম ও মহাস্থানগড়ের রাজা পরশুরামের বিরুদ্ধে হযরত শাহ সুলতান মাহমুদ বলখী মাহিসওয়ারের (১০৪৭ঈঃ) অভিযান, রাজা বল্লাল সেনের বাহিনীর বিরুদ্ধে বিক্রমপুরে আদম শহীদ মক্কীর। (১১৭৯ ঈঃ) সাত হাজার সঙ্গীসহ যুদ্ধ, রামপর বোয়ালিয়ায় (রাজশাহী) সামন্ত রাজার বিরুদ্ধে শাহ মখদুম রূপোসের (১১৮৪) দুই দফা লড়াইয়ের ঘটনা ইতিহাসে বিশেষভাবে স্থান লাভ করেছে।

প্রতিটি লড়াইয়ের পিছনে লক্ষ্য ছিল নির্যাতিত সাধারণ মানুষকে জুলুম থেকে উদ্ধার করা। এ ধরনের যুদ্ধে ইসলাম প্রচারকগণ কোথাও বিজয়ী গাযীর মর্যাদা লাভ করেছেন, কোথাও শাহাদাতবরণ করেছেন। সাধারণ মানুষের জন্য তাদের আত্মত্যাগ তাদেরকে জনগণের আত্মার আত্মীয়ে পরিণত করেছিল। ইসলাম প্রচারকদের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থনের কথা উল্লেখ করে ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, বৌদ্ধরা মুসলিম প্রচারকগণকে সন্মান জানাতেন, তাদেরকে নিজ বাড়ীতে থাকতে দিতেন এবং খাদ্য সরবরাহ করতেন ইসলাম প্রচারকদের । এই সাফল্য সম্পর্কে এম এন রায় লিখেছেনঃ ''বৌদ্ধ মতবাদের পতনের সাথে সাথেই সারদেশে অর্থনৈতিক দুর্গতি, রাজনৈতিক অত্যাচারে, বিচার-বুদ্ধির স্বেচ্চাচারিতা আর আধ্যাত্মিক বিশৃংখলার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র দেশ তখন ধ্বংস ও বিলুপ্তির কবলে পড়ে গেছে। এজন্য নিপীড়িত জনগণ ইসলামের পতাকার নিচে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো।" (দি হিস্টরিক্যাল রোল অব ইসলাম)। তেরো শতকের বৌদ্ধ কবি রামাই পন্ডিত তাঁর শূন্য পুরাণের 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কবিতায় উল্লেখ করেছেন যে, ব্রাহ্মণ্যদের সৃষ্টি-বিনাশী পাশবিক অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য ধর্মঠাকুর তাঁর মাথায় টুপি পরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে ভক্তের মুক্তির জন্য পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন।

(চলবে ...)
[পরবর্তী সংখ্যায় দেখুন]

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় যাকাতের শরীয়াহ গুরুত্ব

ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়া

যাকাত কি ঃ

যাকাত ইমলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। যাকাত একদিকে দরিদ্র, অভাবী ও অক্ষম জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি, অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

আরবী যাকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে যাকাত বলতে ধনীদের ধন-মালে আল্লাহর নির্ধারিত অবশ্য দেয় অংশকে বুঝায় । আল্লাহতায়ালা সম্পদশালীদের সম্পদ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় বণ্টন করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ।

বস্তুত যাকাত একদিকে যাকাত দাতার মন ও আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে, তার ধন-সম্পদকেও পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে দেয়; অন্যদিকে দরিদ্রদের অভাব পূরণে সহায়তা করে এবং সম্পদে ক্রমবৃদ্ধি বয়ে আনে এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, সাদাকাহ প্রদানকারীর মন ও আত্মা পবিত্র হয়, তার ধন-মাল বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃতপক্ষে তা পরিমাণে বেশী হয় ।

যাকাতের ব্যাপারে কোরআন হাদিস কি বলে ?

সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয় । -সূরা হাশরঃ ৭

আমার রহমত সবকিছু পরিব্যাপ্ত করে নিয়েছে। আমি তা লিখে দেব সেই লোকদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে ও যাকাত দেয় এবং যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে । সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৬

তুমি তাদের ধন-মাল থেকে সাদাকাহ (যাকাত) গ্রহণ কর, এর দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করে দাও । -সূরা তওবাঃ ১০৩

কেউ যদি আল্লাহর পুরস্কারের আশায় যাকাত দেয় তাহলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে । কিন্তু যে যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তার কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে যাকাত আদায় করতে হবে এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার অর্ধেক সম্পত্তিও নিয়ে নেওয়া হবে । - আহমদ, নাসাঈ ও বায়হাকী

যে তার সম্পত্তির উপর যাকাত দিল সে যেন তার সকল পাপ ধুয়ে ফেলল । - তাবারানী, ইবনে সুসাইমাহ ও হাকীম

আল্লাহ যাকে ধন দিয়েছেন, সে যদি যাকাত আদায় না করে তাহলে কিয়ামতের দিন তা একটি বিষধর অজগরের রূপ ধারণ করবে যার দু'চোখের উপর দু'টি কালো চিহ্ন থাকবে। বলবে, আমিই তোমার ধন-মাল, আমিই তোমার সঞ্চয় । -বুখারী

যাকাতের শরীয়াহ গুরুত্ব

যাকাত হচ্ছে আল্লাহর হুকুম এবং অন্যতম মৌলিক ফরয। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। ঈমানের পর নামায এবং তারপরই যাকাতের স্থান । কুরআন মজীদের বত্রিশ জায়গায় যাকাতের কথা বলা হয়েছে। তার মধ্যে আটাশ জায়গায় নামায ও যাকাতের উল্লেখ একত্রে করা হয়েছে।

বস্তুত ইসলামে নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করার কোন অবকাশ নেই। ইবনে যায়েদ বলেছেন, "নামায ও যাকাত একসাথে ফরয করা হয়েছে, এ দুটির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি ।" হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, "তোমাদের এক সঙ্গে আদেশ করা হয়েছে নামায কায়েম করা ও যাকাত দেওয়ার জন্য"। তাই কেউ যাকাত না দিলে তার নামাযও হবে না । হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) বলেছেন, "নামায এবং যাকাত একটি অপরটির সম্পূরক, একটি ছাড়া অন্যটি কবুল হয় না।" এ কারণে ইসলাম যাকাত আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবস্থার বিধান করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কেউ যদি আল্লাহর পুরস্কারের আশায় যাকাত দেয় তাহলে তাকে পুরস্কৃত করা হবে । কিন্তু যে যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তার কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে যাকাত আদায় করতে হবে এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার অর্ধেক সম্পত্তিও নিয়ে নেওয়া হবে।" (আহমদ, নাসাঈ ও বায়হাকী)। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) যাকাত না দেয়ায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন ।

যাকাত কারা দেবেন

ইসলামী আইনবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাত কেবলমাত্র স্বাধীন, পূর্ণবয়স্ক মুসলিম নর অথবা নারী যার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে তার উপর নিম্ন শর্ত সাপেক্ষে যাকাত ধার্য হবে । শর্তগুলো হচ্ছে ঃ

1) সম্পদের উপর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা
   সম্পদের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য সম্পদের মালিকানা সুনির্দিষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হওয়া জরুরী ।
2) সম্পদ উৎপাদনক্ষম হওয়া
   যাকাতের জন্য সম্পদকে অবশ্যই উৎপাদনক্ষম, বর্ধনশীল বা প্রবৃদ্ধিমান হতে হবে ।

৩) নিসাব

যাকাত ধার্য হওয়ার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা । নিসাব বলা হয় শরীয়ত নির্ধারিত নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে। সাধারণভাবে ৫২.৫০ তোলা রূপা বা ৭.৫০ তোলা সোনা বা এর সমমূল্যের সম্পদকে নিসাব বলা হয়। কারো কাছে ৭.৫০ তোলা সোনা বা ৫২.৫০ তোলা রূপা থাকলে, বা উভয়টি মিলে ৫২.৫০ তোলা রূপার মূল্যের সমান অথবা সব সম্পদ মিলে ৫২.৫০ তোলা রূপার সমমূল্যের সম্পদ থাকলে সে সম্পদের যাকাত দিতে হবে ।

৪) মৌলক প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকা

সারা বছরের মৌল প্রয়োজন মিটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদ থাকলেই কেবল যাকাত ফরয হবে ।

৫) ঋণমুক্ত হওয়া

যাকাত ফরয হওয়ার জন্যে ঋণমুক্ত হওয়ার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা একটি জরুরী শর্ত ।

৬) সম্পদ এক বছর থাকা

কারো কাছে কমপক্ষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর থাকলেই কেবল সে সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে ।

বিশেষ ক্ষেত্রে যাকাত

১) অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের যাকাত

সম্পদের মালিক যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগল হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে তার আইনানুগ অভিভাবককেই তার সম্পদের যাকাত পরিশোধ করতে হবে ।

২) যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পত্তির যাকাত

যদি যৌথভাবে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোন সম্পদের মালিক হয় তাহলে তাদের প্রত্যেককেই সম্পদে নিজ নিজ অংশের জন্য যাকাত পরিশোধ করতে হবে ।

৩) মৃত ব্যক্তির যাকাত

নির্ধারিত যাকাত পরিশোধ করার পূর্বে যদি সম্পদের মালিক মারা যায়, তাহলে তার উত্তরাধিকারীগণ অথবা তার অছিয়ত মতে কিংবা তত্ত্বাবধায়ক তার সম্পত্তি থেকে প্রথমে যাকাত বাবদ পাওনা এবং কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করবেন এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করবেন ।

৪) তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত সম্পদের যাকাত

মালিকের পক্ষ থেকে সম্পদের দেখা-শোনা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জন্য কোন আইনানুগ তত্ত্বাবধায়কের কাছে সম্পদ ন্যস্ত করা হয়ে থাকলে, সে সম্পদের যাকাত মালিকের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধানকারীকে প্রদান করতে হবে ।

৫) বিদেশে অবস্থিত সম্পদের যাকাত

কারো সম্পদ যদি বিদেশে থাকে এবং সে সম্পদ যদি যাকাতযোগ্য হয় তাহলে তার উপরও তাকে যাকাত দিতে হবে ।

কোন কোন সম্পদের যাকাত দিতে হবে

১) সোনা-রূপা

সোনা-রূপার মধ্যে পিন্ড আকারে রক্ষিত স্বর্ণ-রৌপ্য, সোনা-রূপার বাসন, অলংকার, এসবের বানানোর মূল্য হিসাব করে শতকরা ৭.৫০ ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে ।

২) নগদ অর্থ

হাতে এবং ব্যাংকে রক্ষিত নগদ অর্থ ছাড়াও সঞ্চয়পত্র, সিকিউরিটি, শেয়ার সার্টিফিকেট ইত্যাদি নগদ অর্থ বলে গণ্য হবে ।

৩) ব্যবসায়ের মালামাল

ব্যবসায়ের মালামালের যাকাত নিরূপণকালে বছর শেষে হিসাব সমাপ্তি দিবসে যে সম্পদ থাকবে তাই সারা বছর ছিল ধরে নিয়ে তার উপর যাকাত দিতে হবে ।

৪) কৃষি ফসল

কৃষি ফসলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রেণীর ফসলের নিসাব পৃথক পৃথকভাবে হিসাব করে নিসাব পরিমাণ ফসল হলে যাকাত (উশর) দিতে হবে । উদাহরণস্বরূপ, ধান যদি ৩০ মণ বা তার বেশী হয়, পাট যদি ৩০ মণ বা তার বেশী হয়, তাহলে ফসল তোলার সময়েই তার যাকাত দিতে হবে। তেমনিভাবে কলাই, সরিষা, মধু ইত্যাদি প্রত্যেকটির নিসাব পৃথকভাবে ধরতে হবে ।

৫) খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে কোন নিসাব নেই । খনিজ সম্পদ ব্যক্তিমালিকানায় থাকলে সম্পদ উত্তোলনের পরই হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। খনিজ সম্পদের যাকাতের হার হচ্ছে শতকরা ২০ ভাগ ।

৬) গরু-মহিষ

নিজের কাজে খাটে এবং বিচরণশীল বা 'সায়েমা' নয় এমন গরু-মহিষ বাদ দিয়ে ৩০ টি হলেই তার উপর যাকাত দিতে হবে । যাকাতের হার হবে প্রতি ৩০ টির জন্য একটি ১ বছর বয়সের গরু এবং প্রতি ৪০ টি বা তার অংশের জন্য ২ বছর বয়সের ১ টি গরু

৭) ছাগল-ভেড়া

ছাগল-ভেড়ার সংখ্যা ৪০টি হলে ১টি, ১২০টি পর্যন্ত ২টি , ৩০০ টি পর্যন্ত ৩টি এবং এর উপরে প্রতি ১০০টি ও তার অংশের জন্য আরো ১টি করে ছাগল যাকাত দিতে হবে ।

৮) উট

উটের নিসাব ৫টি । প্রতি ৫টি উটে ১টি করে ছাগল বা ভেড়া যাকাত দিতে হবে। কিন্তু উটের সংখ্যা ৪৪টি হলে ১টি ১ বছরের উষ্ট্রশাবক দিতে হবে। সংখ্যা বাড়ার সাথে এই হারে যাকাত দিতে হবে।

৯) ঘোড়া

হযরত উমর (রাঃ) ঘোড়ার যাকাত চালু করেন। এর আগে ঘোড়ার উপর যাকাত ছিল না। ঘোড়া যদি যানবাহন, বোঝা বহন, বা জিহাদের কাজে ব্যবহত হয় তা হলে যাকাত দিতে হবে না । কিন্তু তা না হলে ঘোড়ার মূল্য ৫২.৫০ তোলা রূপার মূল্যের সমান বা বেশী হলে, তার উপর শতকরা ২.৫০ ভাগ হিসেবে যাকাত দিতে হবে ।

কোন কোন সম্পদে যাকাত নেই

যে সব সম্পদকে যাকাত থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে সেগুলোর একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১) জমি
২) মিল, ফ্যাক্টরী, ওয়ারহাউজ, গুদাম ইত্যাদি
৩) দোকান
৪) বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি
৫) এক বছরের কম বয়সের গবাদিপশু
৬) ব্যবহারের যাবতীয় কাপড়-চোপড়
৭) বই-খাতা-কাগজ ও মুদ্রিত সামগ্রী
৮) গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র, বাসন-কোসন ও সরঞ্জামাদি, তৈলচিত্র, স্ট্যাম্প
৯) অফিসের যাবতীয় আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ইত্যাদি সরঞ্জামাদি
১০) গৃহপালিত সকল প্রকার মুরগী ও পাখী
১১) কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি
১২) চলাচলের যন্ত্র বা গাড়ী
১৩) যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম
১৪) ক্ষণস্থায়ী বা পচনশীল যাবতীয় কৃষিপণ্য
১৫) বপন করার জন্য সংরক্ষিত বীজ
১৬) যাকাত-বছরের মধ্যে পেয়ে সে বছরের মধ্যেই ব্যয় করা হয়েছে এমন যাবতীয় সম্পদ
১৭) দাতব্য বা সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ যা জনগণের উপকার ও কল্যাণে নিয়োজিত
১৮) সরকারী মালিকানাভুক্ত নগদ অর্থ, সোনা-রূপা এবং অন্যান্য সম্পদ

যাকাত কাদের জন্য

কালামে পাকে আট শ্রেণীর লোক যাকাত পাবার যোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা তওবাঃ ৬০

১) ফকির

ফকিরকে বাংলায় গরীব বলা হয়।

২) মিসকীন

যাদের আর্থিক অবস্থা গরীবদের চেয়েও খারাপ তারাই মিসকীন।

৩) আমেলুন

আমলার বহু বচন আমেলুন । 'আমেলুনা আলাইহা ' বলতে যাকাতের কাজে নিযুক্ত লোকদের বুঝানো হয়েছে।

৪) মন জয় করার জন্য

ইসলামের বিরোধিতা বন্ধ করা বা ইসলামের সহায়তার জন্য কারো মন জয় করার প্রয়োজন হলে এবং নও-মুসলিমদের সমস্যা দূর করার জন্য যাকাত তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করা হবে।

৫) গলদেশ মুক্ত করা

গলদেশ মুক্ত করা বলতে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ লোক এবং বন্দীদের মুক্ত করাকে বুঝানো হয়েছে।

৬) ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ

ঋণভারে জর্জরিত লোকেরা মানসিকভাবে সর্বদাই ক্লিষ্ট থাকে এবং কখনও কখনও জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের জীবনী-শক্তির ক্ষয় সাধিত হয়। অনেক সময়ে তারা অন্যায় ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং যথার্থ প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত লোকদের ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করা ইসলামী সমাজের দায়িত। এ জন্য আল্লাহ যাকাতের অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন যাতে সমাজকে সুস্থ রাখা যায়।

৭) আল্লাহর পথে ব্যয়

কুরআনের ভাষায় এ খাতের নাম বলা হয়েছে 'ফী সাবিলিল্লাহ', যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পথে। আল্লাহর পথে কথাটি খুব ব্যাপক। মুসলমানদের সকল নেক কাজ আল্লাহর পথেরই কাজ।

৮) পথিক-প্রবাসী

মুসাফির বা প্রবাসী লোকের বাড়ীতে যত ধন-সম্পত্তিই থাকুক না কেন, পথে বা প্রবাসে সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাকে যাকাত তহবিল হতে প্রয়োজনীয় সাহায্য অবশ্যই দিতে হবে।

যাকাত কোন কোন কাজে ব্যয় করা হবে

কুরআন পাকে উল্লেখিত যাকাতের হকদার ৮ শ্রেণীর লোকের পরিচয় উপরে দেয়া হলো। এখানে বিশেষ করে দরিদ্র-অভাবী ও ঋণগ্রস্ত লোকদের সাহায্য, সহযোগিতা, পুনর্বাসন ও স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য যে কাজ করা উচিত তা হলো ঃ

১) যাকাত তহবিল থেকে দরিদ্র, অভাবী, দুস্থ নারী-পুরুষ, রুগ্ন, অক্ষম, পঙ্গু, বৃদ্ধ, এতিম, বিধবা এবং অনুরূপ অসহায় মানুষের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এরা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয় ।

২) দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর অক্ষম অংশকে এমনভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে মানবিক মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে ।

৩) মুসাফিরদের জন্য এমন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা যাতে পথে তাদের কষ্ট করতে না হয় ।

৪) সংগত কারণে যারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাদের ঋণ-মুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং তাদের রুজি-রোজগারের এমন ব্যবস্থা করে দেয়া যাতে তারা ঋণ করতে বাধ্য না হয় ।

৫) ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাতে সমাজে ইসলামের ভিত মজবুত হতে পারে। এ জন্য গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে ।

৬) দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সন্তান-সন্ততির উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, পাঠাগার ইত্যাদি কায়েম করা যেতে পারে ।

৭) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসার লক্ষ্যে দেশের সকল এলাকায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডিসপেন্সারী ইত্যাদি কায়েম করা যেতে পারে ।

৮) বেকার লোকদের নিয়মিত ভাতা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে ।

৯) দরিদ্র মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিয়মিত স্টাইপেন্ড, স্কলারশিপ এবং অনুরূপ সাহায্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।

১০) এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও যাকাত তহবিল বিরাট অবদান রাখতে পারে ।

যাকাতের আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব

১) যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে

২) যাকাত বিত্তশালীদেরকে পরিশুদ্ধ করে

৩) যাকাত দারিদ্র্য মোচন করে

৪) যাকাত উৎপাদন বৃদ্ধি করে

৫) যাকাত অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে

৬) যাকাত সমাজে শান্তি আনে

যাকাত কখন দেবেন

যাকাত চন্দ্র বছর অনুসারে দেয়াই শ্রেয়। এর মধ্যে আবার রমযান মাস হচ্ছে উত্তম। অন্যান্য মাসে কোন পুণ্যের কাজ করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, রমযান মাসে সে কাজ করলে আল্লাহ তার অনেকগুণ বেশী সওয়াব দিয়ে থাকেন। সে জন্য রমযান মাসে যাকাত দিলে অন্য মাসের তুলনায় অনেক বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। আমাদের দেশে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশেও অনেকেই রমযান মাসে যাকাত দিয়ে থাকেন । কিন্তু সারা বছর যাকাত দিলেও কোন ক্ষতি নেই ।

মোট কথা পরিকল্পিতভাবে যাকাত সংগ্রহ ও ব্যয় বণ্টনের ব্যবস্থা করতে পারলে যে কোন দেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দঃস্থ মানবতার কল্যাণে বিরাট ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে ।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এক্সিম ব্যাংক, ঢাকা

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ

ড. মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান

ইসলামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সর্বদা পরিষ্কার থাকা ও সুন্দর পোশাক পরিধান করা মানুষের জন্মগত স্বভাব। নিজেকে সুন্দর রাখার প্রথম এবং প্রধান উপায় হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখলে অনেক মূল্যবান জিনিসই মূল্যহীন হয়ে যায়। জীব-জানোয়ার ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে, পশুরা যেমন খুশি তেমন চলে, তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ধার ধারে না; আর মানুষ পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার বিষয়টিকে সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করলেও ঈমানদার মুসলমানেরা এটিকে ইবাদতরূপে গণ্য করে থাকেন। কেননা, হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পরিষ্কার-পরেচ্ছন্নতা ঈমানের একটি অঙ্গ। (মুসলিম)

ঈমানদার ব্যক্তিমাত্রই একজন পরিচ্ছন্ন মানুষ। তিনি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে দৈনদিন জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত করে এটি নিয়মিত পালন করেন। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি কম করে হলেও প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের আগে পবিত্রতা অর্জনের জন্য অজু করেন। তিনি দৈনিক পাঁচবার অজু করার জন্য ১৫ বার হাত, পা, নাক, মুখ ও চোখ পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করেন। সময়মতো দিনে একবার গোসল করেন। পোশাক-পরিচ্ছদ সব সময় ধুয়েমুছে পরিষ্কার রাখেন। ঈমানদার ব্যক্তির বসতবাড়ি ও ঘরের আঙিনা পরিচ্ছন্ন থাকে। তিনি মনে করেন যে, তাঁর সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠলে তাঁর দেহ-মন-আত্মাও কলুষমুক্ত হয়ে যাবে। আর নির্মল আত্মা নিয়েই তিনি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) যথার্থই বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন, তিনি পরিচ্ছন্ন এবং তিনি পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন।' (তিরমিজি)

দৈনন্দিন জীবনে মুসলমানদের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের পূর্বশর্ত অজু করা। দিন-রাতে কেউ পাঁচবার অজু করলে তার দেহ অবশ্যই পরিচ্ছন্ন থাকবে। আর দেহ পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও প্রফুল্ল থাকবে। মনোদৈহিক রোগ থেকে বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি পবিত্র মন। যার দেহ ও মন সজীব, রোগব্যাধি তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না। সাধারণত দেহের যে অঙ্গগুলো অধিকাংশ সময় খোলা থাকে, অজুর বিধানে ওই সব অঙ্গ-পত্যঙ্গকে ধৌত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওই অঙ্গগুলো দিয়ে মানবদেহে রোগ-জীবাণু প্রবেশের আশঙ্কা বেশি, তাই ওই অঙ্গ বারবার ধুলে জীবাণু আক্রমণ করার সুযোগ পায় না। পবিত্র কোরআনে অজুর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাজের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল, হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসেহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে।--আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।' (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ৬)

মহানবী (সা.) ছিলেন পরিচ্ছন্নতার এক উজ্জ্বল প্রতীক। তাঁর সব কাজকর্ম ছিল গোছানো। তিনি সবকিছু পরিপাটি করে রাখতেন। শয়নের আগে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিছানা ঝাড় দিতেন। জুতা, কাপড় ইত্যাদি পরিধানের আগে তিনি ঝেড়ে-মুছে পরিষ্কার করে নিতেন। নবীজি সুগন্ধি পছন্দ করতেন। সৌন্দর্যের প্রতীক ফুলও তাঁর খুব প্রিয় ছিল। নবী করিম (সা.) রাতে ঘুমানোর আগে এবং ঘুম থেকে জেগে মেসওয়াক করতেন। (যাদুল মায়াদ) মেসওয়াক মুখের রোগ-জীবাণু ধ্বংসের প্রধান হাতিয়ার। এটি মুখের দুর্গন্ধ প্রতিষেধক। নামাজি ব্যক্তি নিয়মিত মেসওয়াক ব্যবহারের কারণে অসংখ্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পায়। জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও নবীজি মেসওয়াক করার জন্য বারবার ইশারা করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, 'আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক না মনে করতাম, তাহলে প্রত্যেক নামাজের অজুর সঙ্গে তাদের মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।' (বুখারি) তিনি আরও বলেন, 'মেসওয়াক মুখকে পরিষ্কার করে, আর আল্লাহর কাছে এ আমল বেশি পছন্দনীয়।' (নাসাঈ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্ত অপসারণ করা ঈমানি দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। আমাদের দেশের আবহাওয়ার কারণে আমরা পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করলেও তা পারি না। বাতাসের সঙ্গে সর্বক্ষণ ধুলাবালু উড়ছে, যার কারণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যে একটি অস্বস্তিকর পরিবেশে বসবাস করছি, তা থেকে মহানবীর (সা.) মুখনিঃসৃত বাণী আমাদের উত্তরণের পথ দেখাতে পারে। রাস্তায় যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট ডাস্টবিনগুলো ব্যবহারে সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। খোলা ডাস্টবিনগুলো প্রতিনিয়ত পরিবেশ দূষিত করে চলেছে। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যারা বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি আত্মার পবিত্রতা অর্জন করতে পারবে, তারাই সফলকাম। আল্লাহতায়াআলা ঘোষণা করেছেন,'নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সেই ব্যক্তি, যে পবিত্রতা অর্জন করে।' (সূরা আল-আ'লা, আয়াত:১৪)

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য চাই সুস্থ পরিবেশ। নিজে একা পরিষ্কার থাকলে চলবে না; আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি আমাদের সেই পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ–এ সবকিছুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও আবর্জনামুক্ত রাখতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতপক্ষে চেষ্টা করতে হবে। শুধু বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা যথেষ্ট নয়; অন্তরের পরিচ্ছন্নতাও আমাদের অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কালিমা থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ইসলামের দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যদি পরিচ্ছন্নতাকে মেনে চলি, তাহলে রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে পারি। আল্লাহ পাক আমাদের সুন্দর পরিচ্ছন্ন একটি জীবন ও সমাজ গড়ার তাওফিক দান করুন!

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও কলাম লেখক

ইসলাম রাজনৈতিক নয় সামাজিকতার ধর্ম

মক্কা বিজয় ইসলামের সামাজিকতার বিজয় ঘোষণা করেছিল

আহমদ সেলিম রেজা

যারা মিথ্যা কথা বলেনা। যারা আমানতের খেয়ানত করে না। যারা সুদ খায় না, ঘুষ লেনদেন করে না। যারা নারীকে অপমান, অবহেলা করে না। যারা মানুষের অনিষ্ট করে না, এতিম বা রাষ্ট্রের সম্পদ নিজের মনে করে না। যারা বিচার বা সালিশে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ন্যায়বিচার করে, সমাজ বা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকে এবং একসাথে নামাজ আদায় করে- কোরআন হাদিসের আলোকে তারাই ইসলামের অনুসারী বা মুসলমান। আর সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষায় মানুষের এসব আচরণকে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য শিষ্টাচার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সমাজকে চিত্রিত করা হয়েছে, 'সমাজ বলতে মূলত এমন এক ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে একাধিক চরিত্র একত্রে কিছু নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করত একত্রে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে। মানুষের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি একত্র হয়ে লিখিত কিংবা অলিখিত নিয়ম-কানুন তৈরিকরত এরকম একত্র বসবাসের অবস্থাকে সমাজ বলে। মানুষ ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায়, তবে সেখানে মানুষের মতো কাঠামোবদ্ধ সমাজের দৃষ্টান্ত নজরে আসে না। সমাজের দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো, ট্যাবু বা নিষিদ্ধ আচার ও টোটেম বা অনুমোদিত আচার।

সমাজের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, মমত্বের বন্ধন যেমন গড়ে উঠতে পারে; তেমনি তৈরি হতে পারে ঘৃণা, লোভ, জিঘাংসা। তাই সমাজের মধ্যে শৃংখলা ধরে রাখার স্বার্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অলিখিতভাবে তৈরি হয় কিছু নিয়ম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যার লঙ্ঘন চরম অসম্মানজনক এবং সমাজের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য। তবে নিঃসন্দেহে সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার জন্য সৌহার্দ্য, সহযোগিতা একান্ত দরকার। এজন্য ইসলামের আছে মদিনা সনদ, বিদায় হজে ভাষণসহ পবিত্র কোরআন হাদিসের বিধানাবলি।

ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম। সামাজিকতার ধর্ম। ইসলাম মানুষকে এমন কিছু গুণাগুণ লালন করতে শিখিয়েছে যা তাকে কতগুলো বিশেষ গুণে গুণান্বিত তথা মুসলমান হিসেবে সমাজে পরিচিত করেছে। একা নামাজ না পড়ে জামাতে নামাজ পড়া ইসলামের সামাজিকতা। একা না খেয়ে সবাই মিলে খাওয়া ইসলামের সামাজিকতা। পিতা-মাতা-আত্নীয় পরিজন ও প্রতিবেশীর হক আদায় ইসলামের সামাজিকতা। অতিথি ও আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দেয়া ইসলামের সামাজিকতা। মদিনার আনসার সম্প্রদায় হিজরতকারী মক্কার মোহাজের সম্প্রদায়কে খাদ্য, পানি, আশ্রয় দিয়েছিল এবং তাদের আচরণছিল আপনজন বা ভাইয়ের মতো । ইসলামের এই সামাজিকতা আল্লাহর রাসূল শিক্ষা দিয়েছেন। এমনকি নবীর পথে কাঁটা দিয়েছিল বলে তিনি কাঁটাবুড়িকে ঘৃণা করেননি। তার বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগান্ডা, ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশ করেনি। বরং একদিন রাস্তায় কাঁটা নেই দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। বুড়ির কি হয়েছে- খোঁজ নিতে লোক পাঠিয়েছিলেন। কাঁটাবুড়ির অসুস্থতার খবর জানার পর আল্লাহর রাসূল নিজে একজন হেকিমকে সাথে নিয়ে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (সা.) তার উম্মতদের ইসলামের সামাজিকতা পালনের শিক্ষা ও তালিম দিয়ে গিয়েছেন। কিভাবে মানুষকে সমাজে চলতে হবে, কিভাবে নিজের হাত ও জিহবা থেকে অপরকে রক্ষা করতে হবে, কিভাবে লোভ সংবরণ করতে হবে, কোন কাজ মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ আর কোনটা হালাল তার বিধানও তিনি দিয়ে গিয়েছেন। যাকাত ও ফিতরার বিধান, বিচার আচারের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিধান, সম্পদের সুষম বণ্টন ও রক্ষণা-বেক্ষণের বিধান, খ্যাদ্যাভ্যাস, পোশাক, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিধান, নারীর অধিকার, মানুষ হিসেবে সমাজে সকলের সমানাধিকার, সাদা-কালো-ধনী-দরিদ্র বলে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই-এসকল বিধান বা আচার মানুষকে ইসলামই প্রথম শিক্ষা দিয়েছে।

ইসলাম ধর্মের এই সামাজিক গুণ ও বৈশিষ্টের কারণে আরব দেশসহ বিশ্বময় ইসলাম বিজয় লাভ করেছে। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে মুসলমানেরা এই সামাজিক আচরণগুলো রপ্ত ও চর্চা করে আসছে। প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ সা. ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন । মদিনায় হিজরত করে তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের প্রথম সামাজিকতার শিক্ষাই দিয়েছেন। আনসার ও মোহাজের পরস্পর ভাই ইসলামই ঘোষণা করেছে। সম্পদ ও গনিমতের মালে উভয়ের অধিকার সমান ইসলামের ঘোষণা। ইহুদি,খ্রিস্টান ও অন্যদের সাথে এক সমাজে বসবাস করার সামাজিক সংস্কৃতি ইসলামই বিশ্ববাসীকে প্রথম শিখিয়েছে। মদিনা সনদ সে কথাই বলে।

মদিনা সনদ

নবী করিম (সাঃ) মদিনায় মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, মদিনাবাসী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সহাবস্থানের লক্ষ্যে একটি সনদ প্রণয়ন করেন। এ সনদের মূলমন্ত্র ছিল নিজে বাঁচ এবং অন্যকে বাঁচতে দাও। মদিনা সনদের প্রধান শর্তগুলো ছিল নিম্নরুপ ।

১. সনদে স্বাক্ষরকারী মুসলমান, নাসারা এবং পৌত্তলিক সম্প্রদায় সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে ।
২. এই চুক্তি বলে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) মদিনার যে কোন সমস্যার মীমাংসা প্রদান করবেন ।
৩. মুসলমান এবং অন্য সবাই স্বাধীনভাবে যে যার ধর্ম পালন করতে পারবে। কেউ কারো ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না ।
৪. ইহুদিদের মিত্ররাও স্বাধীনাতা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে ।
৫. হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর পূর্বসম্মতি ছাড়া মদিনাবাসী কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না ।
৬. সনদে স্বাক্ষরকারী কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করা হবে।
৭. বহিঃশত্রু কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হলে সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সম্প্রদায়ই ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিহত করবে ।
৮. বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার যুদ্ধ ব্যয় স্ব-স্ব সম্প্রদায় নিজেরাই বহন করবে ।
৯. সকল অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে।
১০. মদিনা শহরকে পবিত্র শহর বলে ঘোষণা করা হল ।
১১. মদিনায় রক্তপাত, হত্যা, অন্যায়, অনাচার নিষিদ্ধ করা হল ।
১২. সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোন ব্যাক্তি অপরাধ করলে তা তার ব্যাক্তিগত অপরাধ বলেই গণ্য করা হবে। এজন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে কোন অবস্থাতেই দোষী সাব্যস্ত করা চলবে না ।

১৩. কোন সম্প্রদায়ই কুরাইশদের সাথে কিংবা বাইরের কোন শত্রুর সাথে কোন চুক্তি বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারবে না ।
১৪. এ সনদের কোন শর্তাবলি কেউ ভঙ্গ করলে তার বিচার করবেন প্রিয় নবী (সা.)। এছাড়া সনদে চুক্তি ভঙ্গকারীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাত কামনা করা হয়েছে ।
১৫. সনদে রক্তপণ আগের মতোই বহাল থাকার ঘোষণা দেয়া হয় ।

সামাজিক ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখতে কিভাবে শত্রুপক্ষকে ছাড় দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে হয় হুদাইবিয়ার সন্ধি বিশ্ববাসীর সামনে আজো তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে চুক্তির শর্তগুলো খুবই অবমাননাকর ও মুসলিমদের স্বার্থবিরোধী। শুধু তাই নয় চুক্তি স্বাক্ষরের সময় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স্বাক্ষর কেটে মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ স্বাক্ষর করতে হবে বলে চাপ দেয়। এসময় মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর রাসূল নিজ হাতে কলম নিয়ে আগের স্বাক্ষর কেটে তাদের দাবি মোতাবেক স্বাক্ষর করেন। আর প্রজ্ঞাময় আল্লাহ একেই বলেছেন ফাতহুম মুবীন বা সুস্পষ্ট বিজয়। কার্যত এই চুক্তির ফলে মুসলমান সম্প্রদায় একটি সামাজিক শক্তি হিসেবে এবং মুহম্মদ সা. এর অনুসারীরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই সন্ধির ফলে পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হয়। রাসূল (সা) মুসলমানদের আরো বেশী প্রশিক্ষণ দানের সুযোগ লাভ করেন। মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য, ধৈর্যশীলতা, পরিস্থিতি মোকাবেলার কৌশল গ্রহণ ও অভ্যন্তরীণ শৃংখলা বিধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আরবের বাইরেও নাজ্জাসীর দরবারে ইসলামের বাণী পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানমূলক পরিবেশে মুসলমানরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে শুরু করেন। আর মাত্র দুই বছরের মধ্যে বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের মতো বেশ কিছু সেরা ব্যক্তিত্ব এই সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হিজরী ষষ্ঠ সন। আল্লাহর রাসূল (সা.) কাবা যিয়ারতের সিদ্ধান্ত নেন। চৌদ্দশ' মুসলমান রাসূলের (সা.) সংগী হন। মুসলিমদের কোন সামরিক উদ্দেশ্য ছিলো না। তবে প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেকের সঙ্গেই ছিলো একখানি কোষবদ্ধ তলোয়ার। আল্লাহর রাসূল (সা.) হুদাইবিয়া নামক স্থানে (বর্তমান শমীসা) যাত্রাবিরতি করেন। এসময় কুরাইশদের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর তাঁর কাছে পৌঁছে। সে প্রেক্ষিতে প্রিয় নবী (সা.) এর দূত গেল কুরাইশদের কাছে। তাদের জানানো হলো যে, পবিত্র ক্বাবাঘর যিয়ারাত ছাড়া এ সফরের ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে রাজি হলো না। উল্টো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দূত উসমান ইবনু আফফানকে (রা.) কুরাইশরা আটক রাখে।

এদিকে উসমান (রা) শহীদ হয়েছেন বলে মুসলমানদের কাছে খবর রটে যায়। এসময় রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি বাবলা গাছের নিচে বসে সকলের কাছ থেকে একটি শপথ নেন। যার মূল কথা হলো, আমরা শেষ হয়ে যাবো, কিন্তু লড়াই থেকে পিছু হটবো না। এই শপথের নাম বাইয়াতে রিদওয়ান। মুসলমানদের এই শপথের কথা কুরাইশদের কাছে পৌঁছালে তারা পরিস্থিতি অনকূলে রাখতে উসমান (রা)-কে নিরাপদে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। সাথে কুরাইশদের দূত সুহাইল ইবনু আমর আসেন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। আল্লাহর রাসূলের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ বাদানুবাদের পর নিম্নরূপে চুক্তির শর্ত ঠিক হয়।

১) এ বৎসর মুসলমানদেরকে হজ্জব্রত পালন না করেই ফিরে যেতে হবে।
২) তাদেরকে পরবর্তী বৎসর কা'বাগৃহ দর্শনের অনুমতি দেয়া হবে।
৩) প্রয়োজনীয় অস্ত্র তীর্থযাত্রীরা সঙ্গে নিয়ে 'কোষবদ্ধ অবস্থায়' তিন দিনের জন্যে মক্কায় থাকতে পারবে।
৪) দশ বৎসরের জন্যে শত্রুতা বন্ধ থাকবে এবং কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে না। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায় এই নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এদের কারও প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তিভঙ্গের নামান্তর।
৫) যদি কুরাইশদের কোন ব্যক্তি অভিভাবক বা প্রধানদের সম্মতি ব্যতিরেকে মুহম্মদের দলভুক্ত হয়, তবে তাকে কুরাইশদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।
৬) মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কেউ মক্কাবাসীদের কাছে ফিরে যায়, তবে তাকে ফেরৎ দেয়া হবে না।
৭) কোন গোত্র যদি কুরাইশ কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায় তবে বাধামুক্ত অবস্থায় স্বাধীনভাবে তা করতে পারবে।

এই সন্ধি স্থাপনে মুহম্মদ (সা.) যে সংযম ও উদারতা দেখিয়েছিলেন তা ছিল মুসলমানদের চিরকালীন আদর্শ। সন্ধিপত্র লেখার ভার ছিল হযরত আলী (রা.) এর উপর। তিনি লিখতে শুরু করলেন, 'পরম করুণাময় আল্লাহর নামে যিন রহমান.... কুরাইশ প্রতিনিধি ছোহেল বলল, 'তোমাদের এই রহমানকে আমরা চিনি না।' তখন মুহম্মদ সা. শান্তভাবে নির্দেশ দিলেন, তার কথানুসারে লেখ। তারপর আলী রা. পরবর্তী রেওয়াতে লিখতে শুরু করলেন। আল্লাহর রাসূল মুহম্মদ (সা.) কুরাইশ প্রতিনিধি ছোহেলের সাথে এই মর্মে সন্ধি করছেন যে,...' ছোহেল আপত্তি করে বলল, 'আমরা তাকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে নিলে আর এত গন্ডগোল হবে কেন? মুহম্মদ রাসূলুল্লাহ এর লিখতে হবে মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ।' এসময় মুসলমানদের ক্ষোভ ও উত্তেজনা ধৈযেরে সীমা অতিক্রম করল। কিন্তু নবীজী যখন আলী (রা.) কে বললেন, 'আমি আব্দুল্লাহর পুত্র এ তো মিথ্যে নয়। সুতরাং তার কথা অনুসারেই লেখ।' আলী (রা.) বললেন, 'হুজুর ক্ষমা করবেন। আমি এটা কাটতে পারব না।' তখন মুহম্মদ (সা.) নিজেই কলম ধরে তা কেটে দিলেন।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর আগত কুরাইশ দূত কুরাইশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলেছিল, 'আমি খসরু, কায়সার ও নাজ্জাসীর মত রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ নৃপতি দেখেছি। কিন্তু মুহম্মদের মত কোন নৃপতি দেখিনি, যিনি তার অধীনস্থদের কাছ থেকে এত অধিক সম্মান ও আনুগত্য পেয়ে থাকেন।'

এদিকে যখন মুসলমানরা বাবলা বৃক্ষের নিচে শপথ করল। আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে ওহী নাজিল হলো। "যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্বরই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।(৪৮:১০) বায়াতে রিযওয়ান সম্পর্কে এই আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল।

"আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"(৪৮:১৮-১৯)

এরপর ঘটল প্রিয় নবী (সা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে প্রথম সংঘটিত আক্রমণের ঘটনা। মক্কার ৮০ জন পৌত্তলিক মুহাম্মদকে অতর্কিত হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তায়নীম পাহাড় থেকে সতর্কতার সাথে নিচে অবতরণ করল। এরা মুহাম্মদ (সা.) এর তাঁবুর চারপাশ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকল। উদ্দেশ্য কোন অসতর্ক অবস্থায় বেরিয়ে এলে তাকে হত্যা করা। একসময় পাথর ও তীর দিয়ে মুহাম্মদ ও মুসলমানদেরকে তারা আক্রমণ করল। অতঃপর তারা সকলেই বন্দী হল মুসলমানদের হাতে। মুহাম্মদ (সা.) তাদের সকলকেই মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দিলেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হল-'তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (৪৮:২৪)

সবশেষে বিনাযুদ্ধে মক্কা বিজয় এবং পরাজিতদের প্রতি সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা ও তাদের প্রতি বিজয়ীদের মানবিক আচরণ ইসলামকে চূড়ান্তভাবে সামাজিক ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর বিদায় হজের ভাষণে ইসলামের এই সামাজিকতারই চূড়ান্ত বিজয় ঘোষিত হয়েছে।

বিদায় হজের ভাষণ

'হে লোক সকল! আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন, হে মানবজাতি! তোমাদের আমি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে পয়দা করেছি এবং তোমাদের সমাজ ও গোত্রে ভাগ করে দিয়েছি যেন তোমরা পরস্পরের পরিচয় জানতে পারো। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর দরবারে অধিকতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া অবলম্বন করে, সব বিষয়ে আল্লাহর কথা অধিক খেয়াল রাখে। ইসলামে জাতি, শ্রেণীভেদ ও বর্ণবৈষম্য নেই। আরবের ওপর কোনো আজমের, আজমের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদার ভিত্তি হলো কেবলমাত্র তাকওয়া।'

যে ব্যক্তি নিজের পিতার স্থলে অপরকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, নিজের মাওলা বা অভিভাবককে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে মাওলা বা অভিভাবক বলে পরিচয় দেয় তার ওপর আল্লাহর লা'নত।

ঋণ অবশ্যই ফেরত দিতে হবে। প্রত্যেক আমানত তার হকদারের কাছে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে।

কারো সম্পত্তি সে যদি স্বেচ্ছায় না দেয়, তবে তা অপর কারো জন্য হালাল নয়। সুতরাং তোমরা একজন অপরজনের ওপর জুলুম করবে না। এমনিভাবে কোনো স্ত্রীর জন্য তার স্বামী সম্পত্তির কোনো কিছু তার সম্মতি ব্যক্তিরেকে কাউকে দেয়া হালাল নয়।

যদি কোনো নাক, কান কাটা হাবশি দাসকেও তোমাদের আমির বানিয়ে দেয়া হয় তবে সে যত দিন আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের পরিচালিত করবে, ততদিন অবশ্যই তার কথা মানবে, তার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে।

শোনো, তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত করবে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথারীতি আদায় করবে, রমজানের রোজা পালন করবে, স্বেচ্ছায় ও খুশি মনে তোমাদের সম্পদের জাকাত দেবে, তোমাদের রবের ঘর বায়তুল্লাহর হজ করবে আর আমিরের ইতা'আত করবে, তা হলে তোমরা জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।

হে লোক সকল! আমার পর আর কোনো নবী নেই, আর তোমাদের পর কোনো উম্মতও নেই।

আমি তোমাদের কাছে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। যত দিন তোমরা এ দু'টোকে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা গুমরাহ হবে না। সে দু'টো হলো আল্‌রাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত।

তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকবে। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা দীনের ব্যাপারে এই বাড়াবাড়ির দরুন ধ্বংস হয়েছে।

এই ভূমিতে আবার শয়তানের পূজা হবে এ বিষয়ে শয়তান নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে তোমরা তার অনুসরণে লিপ্ত হয়ে পড়বে। এতে সে সন্তুষ্ট হবে। সুতরাং তোমাদের দীনের বিষয়ে তোমরা শয়তান থেকে সাবধান থেকো।

শোনো, তোমরা যারা উপস্থিত আছো, যারা উপস্থিত নেই তাদের কাছে এই পয়গাম পৌঁছে দিয়ো। অনেক সময় দেখা যায়, যার কাছে পৌঁছানো হয় সে পৌঁছানেওয়ালার তুলনায় অধিক সংরক্ষণকারী হয়। তোমাদের আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। তখন তোমরা কী বলবে? সমবেত সবাই সমস্বরে উত্তর দিলেন ঃ আমরা সাক্ষ্য দিব, আপনি নিশ্চয় আপনার ওপর অর্পিত আমানত আদায় করেছেন, রিসালতের দায়িত্ব যথাযথ আনজাম দিয়েছেন এবং সবাইকে নসিহত করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকাশের দিকে পবিত্র শাহাদাত অঙ্গুলি তুলে আবার নিচে মানুষের দিকে নামালেন।

হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। হে আল্লাহ। তুমি সাক্ষী থাকো।

এই সব ঘটনাবলির কোথাও কাউকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে বা নাজ্জাসিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে বা মদিনায় নিজের রাজত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্য কোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। বরং সকল ঘটনাবলি সংঘটিত হয়েছে আল্লাহতা'লা ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন ও আনুগত্য হাসিলের জন্য। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, "যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহর কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে; আল্লাহ সত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।(৪৮:১০)

মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্য করা, তাঁর শিক্ষা আদর্শ নির্দেশাবলীকে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়নের জন্য এটা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করা। দুনিয়াবি কোন লক্ষ্য অর্জন বা মানুষের কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অজর্নের চেষ্টা করি এবং তিনি যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে যে কোন সময় যে কোনভাবে যেভাবে ইচ্ছা মুসলমানদের সেভাবে বিজয় দান করবেন।

আহমদ সেলিম রেজা
সিনিয়র রিপর্টার, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

রিসার্চ প্রকাশনায় লেখা প্রদান প্রসঙ্গে

গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ রিসার্চ প্রকাশনায় কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক ইসলাম বিষয়ক আর্টিকেল ছাপা হয়। এতে আপনি আপনার মৌলিক ইসলামী বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, কবিতা ও অন্যান্য সময়োপযোগী মানব কল্যাণ সহায়ক লেখা পাঠিয়ে দ্বীনি খেদমতে শরিক হতে পারেন। এর সার্বিক উন্নয়নে আপনার সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার এবং প্রকাশনার জন্য একটি সুন্দর ইসলামী নাম পাঠানোরও অনুরোধ রইল।

লেখা জমা দেয়ার শর্তাবলি ঃ

- বাংলা বা ইংরেজি, যে কোন ভাষায় হতে পারে (অনূর্ধ্ব ২০০০ শব্দের মধ্যে);
- পরিষ্কারভাবে টাইপ করা সফ্ট কপি হতে হবে (MS Word 2003 ভার্সনে বাংলা হলে SutonnyMJ ফন্ট এবং ইংরেজি হলে Arial MJ ফন্ট ব্যবহার করার অনুরোধ রইল);
- সাথে লেখকের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ও এক কপি ছবি দিতে হবে;
- সম্পাদনা পরিষদ যে কোন লেখা পরিবর্তন/ পরিমার্জন করতে পারবেন।

এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

সম্পাদক
ফোন ঃ ৮৮২৯২৪৩, ০১৫৫২৪৫৪৬৭২
E-mail: gcmisbd@gmail.com

নির্বাচিত সহীহ আমল

৮ম সংস্করণ

বিনামূল্যে বিতরণ

প্রাপ্তিস্থান ঃ গুলশান সেন্ট্রাল মসজিদ এন্ড ঈদগাহ সোসাইটি
১১১, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২। ফোন ঃ ৮৮২৯২৪৩
এক্সিম ব্যাংক ও সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স-এর সকল শাখায় পাওয়া যাচ্ছে